ঈমান আনার পর প্রথম ফরজ

মুসলিম ভূমির প্রতিরক্ষা

সংকলন ও সম্পাদনা

মাওলানা মুহাম্মাদ ইসহাক খান

ঈমান আনার পর প্রথম ফরজ

মুসলিম ভূমির প্রতিরক্ষা

ড. আব্দুল্লাহ আযযাম রহ.

সংকলন ও সম্পাদনা

মাওলানা মুহাম্মাদ ইসহাক খান

লেখক, সাংবাদিক ও কলামিষ্ট

খান প্রকাশনী

দোকান নং ৩৮, ইসলামী টাওয়ার,

১১ বাংলাবাজার, ঢাকা-১১০০। ফোন ০১৭৪০১৯২৪১১

কেমন ছিলেন ড. আব্দুল্লাহ আয্যাম রহ.!

আব্দুল্লাহ ইউসুফ আয্যাম রহ. জন্মগ্রহণ করেন ১৯৪১ সালে দখলকৃত পবিত্রভূমি ফিলিস্তিনের জেনিন প্রদেশের আসবাহ্ আল হারতিয়া নামক গ্রামে। তিনি এমন একটি পরিবারে বেড়ে উঠেছিলেন, যেখান থেকে তিনি শিক্ষা পেয়েছিলেন ইসলাম সর্ম্পকে এবং ভালোবাসতে শিখেছিলেন আল্লাহ্ ও তাঁর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে, আল্লাহর পথের মুজাহিদীন ও সংকর্মশীল ব্যক্তিগণদের। লাভ করেছিলেন আখিরাতের প্রকৃত উপলব্ধি।
আব্দুল্লাহ আয্যাম রহ. ছিলেন এমন একজন ব্যতিক্রমধর্মী কিশোর যিনি খুব অল্প বয়সেই ইসলামের দাওয়াতের কাজ শুরু করেন। তার সহচররা তাকে ধর্মভীরু কিশোর হিসাবেই জানতেন। বাল্যকালেই তাঁর থেকে কিছু অসাধারণ গুণাবলী প্রকাশিত হয়েছিল, যা তাঁর শিক্ষকরাও উপলব্ধি করতে পেরেছিলেন অথচ তখন তিনি সবেমাত্র প্রাথমিক বিদ্যালয়ে পড়াশোনা করছেন।

শাইখ আব্দুল্লাহ আয্যাম রহ. পরিচিত ছিলেন দৃঢ় নিষ্ঠাবান এবং গম্ভীর প্রকৃতির একজন সৎ মানুষরূপে। তিনি তাঁর গ্রামেই প্রাথমিক এবং মাধ্যমিক স্তরের পড়াশোনা শেষ করেন, তাঁর সহপাঠীদের মধ্যে তিনি ছিলেন সবচেয়ে তরুণ, সবচেয়ে সুদর্শন এবং মেধাবী। খাদরী কলেজ থেকে গ্রাজুয়েট শেষ করার পর তিনি দক্ষিণ জর্ডানের আদ্দিন নামক গ্রামে শিক্ষকতা পেশায় সম্পৃক্ত হন। এরপরে তিনি দামেস্কের বিশ্ববিদ্যালয়ের শারিয়াহ বিভাগে পড়াশোনার জন্য ভর্তি হন এবং সেখান থেকে তিনি ১৯৬৬ সালে শারিয়াহ (ইসলামিক আইন) এর উপর বি,এ ডিগ্রি লাভ করেন। ১৯৬৭ সালে যখন ইহুদীরা পশ্চিম তীর দখন করে নেয় তখন তিনি সেখান থেকে হিজরত করে জর্ডানে যাওয়ার সিদ্ধান্ত নেন, কারণ তিনি ফিলিস্তিনের মধ্যে ইহুদীদের দখদারিত্বের অধীনে থাকতে চাচ্ছিলেন না।

পরবর্তীতে তিনি ১৯৭০ সালে ফিলিস্তিনের উপর ইসরাইলী আগ্রাসী বাহিনীর বিরুদ্ধে জর্ডান থেকে জিহাদে যোগদান করেন। এর কিছুদিন পরেই তিনি চলে যান মিশরে এবং সেখানে আল-আজহার বিশ্ববিদ্যালয় থেকে শারিয়াহ্-এর উপর মাষ্টার্স ডিগ্রী লাভ করেন।
১৯৭০ সালের পরে জর্ডানের বাহিরে জিহাদ করাকে পি, এল, ও বাহিনী জোরপূর্বক বন্ধ করে দেয়। তখন তিনি জর্ডানের আম্মান বিশ্ববিদ্যালয়ে প্রভাষক হিসেবে দায়িত্ব পালন করেন। ১৯৭১ সালে তিনি কায়রোতে আল-আজহার বিশ্ববিদ্যালয়ের পক্ষ থেকে পান্ডিত্যের পুরুষ্কার লাভ করেন, সেখানে থেকে তিনি ইসলামিক আইনের বিজ্ঞান ও দর্শন (উসূলুল ফিক্হ)-এর উপর পিএইচডি ডিগ্রী লাভ করেন। ১৯৭৩ সালে মিশরে থাকাকালীন তিনি শহীদ সাইয়্যেদ কুতুব রহ. (১৯০৬- ১৯৬৬) -এর পরিবারের খোঁজ-খবর রাখতেন।

|াইখ আব্দুল্লাহ্ আয্যাম রহ. ফিলিস্তিনের জিহাদের মধ্যে একটি দীর্ঘ সময় |তিবাহিত করেন। যদিও সেখানকার কিছু বিষয় তাঁর খুবই অপছন্দনীয় ছিল, যমন এর মধ্যে অনেককেই যোগদান করেছিল যারা ইসলাম থেকে অনেক দূরে ছিল। তাদের ব্যাপারে তিনি বলতেন কিভাবে তারা ফিলিস্তিন মুক্তির জিহাদে সফল হবে, যেখানে তারা প্লেয়িং কার্ড ও গান শোনা ইত্যাদির মধ্যে দিয়ে রাত অতিবাহিত করে?

শাইখ আব্দুল্লাহ আয্যাম রহ. আরও উল্লেখ করে বলেন, হাজারো মানুষের মধ্যে জনবহুল জায়গায় যখন তাদের সবাইকে সালাতের জন্য আহ্বান করা হতো, তখন তাদের মধ্যে থেকে এত কম সংখ্যক মানুষ সালাতে উপস্থিত হত যা এক হাতের আঙ্গুল দিয়েই গনা যায়। তিনি তাদেরকে ইসলামের দিকে পরিচালনার চেষ্টা করতেন, কিন্তু তারা তাঁর এই প্রচেষ্টার বিরোধীতা করত। একদিন তিনি ফিলিস্তিনের জাতীয়তাবাদী এক মুক্তিযোদ্ধাকে জিজ্ঞাসা করলেন, ফিলিস্তিনে চলমান এই আন্দোলন ও জিহাদের চূড়ান্ত লক্ষ্য কি? আপনারা এটি কি ইসলামের জন্য করছেন না? এই অভ্যুত্থানে দ্বীনের সাথে কী সম্পর্ক রয়েছে?

জাতীয়তাবাদের ভূত কাঁধে নেয়া সেই যোদ্ধা বোকার মতো এবং সুস্পষ্ট ভাষায় বললো, "আমাদের এই অভ্যুত্থানের পিছনে দ্বীনের কোন সম্পর্ক নেই।" (অর্থাৎ তাদের সংগ্রাম ও যুদ্ধ ইসলাম প্রতিষ্ঠার জন্য নয়।)

এটি ছিলো সেখানে তাঁর অবস্থানের শেষ মুহুর্তের কথা, এরপর তিনি ফিলিস্তিন ত্যাগ করে সৌদি আরবে সেখানকার বিশ্ববিদ্যালয়ে শিক্ষকতার জন্য চলে যান।

যখন শাইখ আব্দুল্লাহ আয্যাম রহ. উপলব্ধি করতে পারলেন যে, তাওহীদ ও ইসলামের সঠিক চেতনায় উদ্বুদ্ধ ঐক্যবদ্ধ মুসলিম তারুণ্যই একমাত্র এই উম্মাহর বিজয় ফিরিয়ে আনতে পারে, তখন তখন থেকে জিহাদ এবং বন্দুক হয়ে যায় তার প্রধান কাজ ও বিনোদন। তাই তখন থেকে তার ঘোষণা ছিলো- "আর কোন সমঝোতা নয়, নয় সংলাপ অথবা আলাপ-আলোচনা, সমাধান একমাত্র জিহাদ এবং রাইফেল।"

তিনি যা বলতেন, তার উপর আগে তিনি নিজে আমল করতেন। শাইখ আব্দুল্লাহ আয্যাম রহ. ছিলেন প্রথম আরব যিনি আফগানিস্তানে সোভিয়েত ইউনিয়নের কমিউনিষ্টদের বিরুদ্ধে জিহাদে যোগদান করেছিলেন।

১৯৮০ সালে তিনি সৌদি আরবে থাকাকালীন সময়ে একবার একজন আফগান মুজাহিদের সাথে তাঁর সাক্ষাত হয় যিনি হজ্জ করার উদ্দেশ্যে সেখানে এসেছিলেন। অতঃপর তিনি তাঁদের মধ্যেই সময় কাটালেন এবং আফগান জিহাদের বিষয়ে আরো কিছু জানতে চাইলেন। যখন তাঁকে আফগান জিহাদের ঘটনাগুলো বলা হচ্ছিলো তখন এ বিষয়গুলো তাঁর কাছে একেবারেই নতুন ও আশ্চর্যজনক মনে হচ্ছিলো। তিনি বুঝতে পারলেন যে এতোদিন যাবৎ তিনি

এই পথটিকেই খোঁজ করছিলেন। এভাবেই তিনি সৌদি আরবের জেদ্দায় বাদশাহ আব্দুল আজিজ বিশ্ববিদ্যালয় থেকে তাঁর শিক্ষকতা পেশাকে ত্যাগ করেন এবং সেখান থেকে তিনি পাকিস্তানের ইসলামাবাদে চলে যান জিহাদে অংশগ্রহণ করার জন্য এবং তাঁর বাকী জীবন তিনি এর মধ্যেই অতিবাহিত করেন। সেখানে গিয়ে তিনি আরও কিছু মুজাহিদ নেতার খোঁজ পেয়ে যান।
পাকিস্তানে অবস্থানের প্রথম দিকেই তিনি ইসলামাবাদের আর্ন্তজাতিক ইসলামিক বিশ্ববিদ্যালয়ে প্রভাষক হিসেবে যোগদান করেন। এর কিছুদিন পরই তিনি সেই বিশ্ববিদ্যালয় ছেড়ে দিয়ে পুরোপুরি আফগানিস্তানের জিহাদের কাজে আত্মনিয়োগ করেন।
১৯৮০ সালের প্রথম দিকেই শাইখ আব্দুল্লাহ আয্যম রহ. জিহাদের অভিজ্ঞতা অর্জনের জন্য আফগানিস্তানে আসেন। এই জিহাদের মধ্যে আত্মনিয়োগের মাধ্যমে তিনি আল্লাহর পথে যুদ্ধ করার পূর্ণ তৃপ্তি অনুভব করেন, ঠিক যেভাবে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছিলেন, "আল্লাহর পথে যুদ্ধের ময়দানে এক মুহূর্ত দন্ডায়মান হওয়া, ৬০ বছর ধরে ইবাদতের চেয়ে শ্রেয়।"

এই হাদীসের দ্বারা উদ্বুদ্ধ হয়ে শাইখ আব্দুল্লাহ আয্যাম রহ. এমনকি তাঁর পরিবারকে পর্যন্ত পাকিস্তানে নিয়ে আসেন। যাতে তিনি জিহাদের ময়দানের আরও নিকটবর্তী হতে পারেন। এর কিছুদিন পরেই তিনি জিহাদ ও শাহাদাতের ভূমিতে অবস্থান করার উদ্দেশ্যে ইসলামাবাদ ছেড়ে পেশোয়ারে চলে যান।
পেশোয়ারে আব্দুল্লাহ আযাযাম ও তাঁর প্রিয় বন্ধু উসামা বিন লাদেন বায়তুল আনসার (মুজাহিদীনদের সেবা সংস্থা) এর সন্ধান পান। যারা আফগান জিহাদের জন্য সমস্ত প্রকার সাহায্য সহযোগিতা করতে প্রস্তুত ছিল। এই সংস্থা অনেক নতুন মুজাহিদীনকে পাকিস্তানে প্রশিক্ষণ দান করতো যাতে তারা আফগানিস্তানে সম্মুখ কাতারে থেকে জিহাদ করতে পারে।
জিহাদের প্রচন্ড আকাঙ্খার কারণে শায়খ শুধু এটুকু করেই ক্ষ্যান্ত হননি বরং তিনি সরাসরি জিহাদের প্রথম কাতারেও শামিল হন এবং সাহসিকতার সাথে বীরের মত ভূমিকা পালন করেন।
আফগানিস্তানে তিনি একটি নির্দিষ্ট জায়গায় খুব সময়ই অবস্থান করতেন। তিনি গোটা দেশ সফর করেছেন; এর অধিকাংশ প্রদেশগুলো হচ্ছে, লোগার, কান্দাহার, হিন্দুকুশ পর্বতমালা, পাঞ্জসের উপত্যকা, কাবুল, জালালাবাদ। এই সফর করার কারণে তিনি আফগানিস্তানের সাধারণ যোদ্ধাদের সাথে পরিচিত হবার সুযোগ পান যারা আল্লাহর কালিমাকে প্রতিষ্ঠিত করার জন্য নিজেদের জীবন ও সম্পদ দ্বারা জিহাদে লিপ্ত ছিল।
সফর থেকে ফেরত আসার পর পেশোয়ারে তিনি নিরবিচ্ছিন্নভাবে জিহাদের ব্যাপারে খুতবা দিতে লাগলেন। তিনি বিভক্ত মুজাহিদীন নেতাদের ঐক্যবদ্ধ হওয়ার জন্য দুয়া করতেন এবং যারা এখন পর্যন্ত জিহাদের কাতারে শামিল

শাইখ আব্দুল্লাহ্ আয্যাম রহ. ফিলিস্তিনের জিহাদের মধ্যে একটি দীর্ঘ সময় অতিবাহিত করেন। যদিও সেখানকার কিছু বিষয় তাঁর খুবই অপছন্দনীয় ছিল, যেমন এর মধ্যে অনেককেই যোগদান করেছিল যারা ইসলাম থেকে অনেক দূরে ছিল। তাদের ব্যাপারে তিনি বলতেন কিভাবে তারা ফিলিস্তিন মুক্তির জিহাদে সফল হবে, যেখানে তারা প্লেয়িং কার্ড ও গান শোনা ইত্যাদির মধ্যে দিয়ে রাত অতিবাহিত করে?

শাইখ আব্দুল্লাহ আয্যাম রহ. আরও উল্লেখ করে বলেন, হাজারো মানুষের মধ্যে জনবহুল জায়গায় যখন তাদের সবাইকে সালাতের জন্য আহ্বান করা হতো, তখন তাদের মধ্যে থেকে এত কম সংখ্যক মানুষ সালাতে উপস্থিত হত যা এক হাতের আঙ্গুল দিয়েই গনা যায়। তিনি তাদেরকে ইসলামের দিকে পরিচালনার চেষ্টা করতেন, কিন্তু তারা তাঁর এই প্রচেষ্টার বিরোধীতা করত। একদিন তিনি ফিলিস্তিনের জাতীয়তাবাদী এক মুক্তিযোদ্ধাকে জিজ্ঞাসা করলেন, ফিলিস্তিনে চলমান এই আন্দোলন ও জিহাদের চূড়ান্ত লক্ষ্য কি? আপনারা এটি কি ইসলামের জন্য করছেন না? এই অভ্যুত্থানে দ্বীনের সাথে কী সম্পর্ক রয়েছে?

জাতীয়তাবাদের ভূত কাঁধে নেয়া সেই যোদ্ধা বোকার মতো এবং সুস্পষ্ট ভাষায় বললো, "আমাদের এই অভ্যুত্থানের পিছনে দ্বীনের কোন সম্পর্ক নেই।" (অর্থাৎ তাদের সংগ্রাম ও যুদ্ধ ইসলাম প্রতিষ্ঠার জন্য নয়।)

এটি ছিলো সেখানে তাঁর অবস্থানের শেষ মুহুর্তের কথা, এরপর তিনি ফিলিস্তিন ত্যাগ করে সৌদি আরবে সেখানকার বিশ্ববিদ্যালয়ে শিক্ষকতার জন্য চলে যান।

যখন শাইখ আব্দুল্লাহ আয্যাম রহ. উপলব্ধি করতে পারলেন যে, তাওহীদ ও ইসলামের সঠিক চেতনায় উদ্বুদ্ধ ঐক্যবদ্ধ মুসলিম তারুণ্যই একমাত্র এই উম্মাহর বিজয় ফিরিয়ে আনতে পারে, তখন তখন থেকে জিহাদ এবং বন্দুক হয়ে যায় তার প্রধান কাজ ও বিনোদন। তাই তখন থেকে তার ঘোষণা ছিলো- "আর কোন সমঝোতা নয়, নয় সংলাপ অথবা আলাপ-আলোচনা, সমাধান একমাত্র জিহাদ এবং রাইফেল।"

তিনি যা বলতেন, তার উপর আগে তিনি নিজে আমল করতেন। শাইখ আব্দুল্লাহ আয্যাম রহ. ছিলেন প্রথম আরব যিনি আফগানিস্তানে সোভিয়েত ইউনিয়নের কমিউনিষ্টদের বিরুদ্ধে জিহাদে যোগদান করেছিলেন।

১৯৮০ সালে তিনি সৌদি আরবে থাকাকালীন সময়ে একবার একজন আফগান মুজাহিদের সাথে তাঁর সাক্ষাত হয় যিনি হজ্জ করার উদ্দেশ্যে সেখানে এসেছিলেন। অতঃপর তিনি তাঁদের মধ্যেই সময় কাটালেন এবং আফগান জিহাদের বিষয়ে আরো কিছু জানতে চাইলেন। যখন তাঁকে আফগান জিহাদের ঘটনাগুলো বলা হচ্ছিলো তখন এ বিষয়গুলো তাঁর কাছে একেবারেই নতুন ও আশ্চর্যজনক মনে হচ্ছিলো। তিনি বুঝতে পারলেন যে এতোদিন যাবৎ তিনি

এই পথটিকেই খোঁজ করছিলেন। এভাবেই তিনি সৌদি আরবের জেদ্দায় বাদশাহ আব্দুল আজিজ বিশ্ববিদ্যালয় থেকে তাঁর শিক্ষকতা পেশাকে ত্যাগ করেন এবং সেখান থেকে তিনি পাকিস্তানের ইসলামাবাদে চলে যান জিহাদে অংশগ্রহণ করার জন্য এবং তাঁর বাকী জীবন তিনি এর মধ্যেই অতিবাহিত করেন। সেখানে গিয়ে তিনি আরও কিছু মুজাহিদ নেতার খোঁজ পেয়ে যান।
পাকিস্তানে অবস্থানের প্রথম দিকেই তিনি ইসলামাবাদের আর্ন্তজাতিক ইসলামিক বিশ্ববিদ্যালয়ে প্রভাষক হিসেবে যোগদান করেন। এর কিছুদিন পরই তিনি সেই বিশ্ববিদ্যালয় ছেড়ে দিয়ে পুরোপুরি আফগানিস্তানের জিহাদের কাজে আত্মনিয়োগ করেন।
১৯৮০ সালের প্রথম দিকেই শাইখ আব্দুল্লাহ আয্যম রহ. জিহাদের অভিজ্ঞতা অর্জনের জন্য আফগানিস্তানে আসেন। এই জিহাদের মধ্যে আত্মনিয়োগের মাধ্যমে তিনি আল্লাহর পথে যুদ্ধ করার পূর্ণ তৃপ্তি অনুভব করেন, ঠিক যেভাবে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছিলেন, "আল্লাহর পথে যুদ্ধের ময়দানে এক মুহুর্ত দন্ডায়মান হওয়া, ৬০ বছর ধরে ইবাদতের চেয়ে শ্রেয়।"

এই হাদীসের দ্বারা উদ্বুদ্ধ হয়ে শাইখ আব্দুল্লাহ আয্যাম রহ. এমনকি তাঁর পরিবারকে পর্যন্ত পাকিস্তানে নিযে আসেন। যাতে তিনি জিহাদের ময়দানের আরও নিকটবর্তী হতে পারেন। এর কিছুদিন পরেই তিনি জিহাদ ও শাহাদাতের ভূমিতে অবস্থান করার উদ্দেশ্যে ইসলামাবাদ ছেড়ে পেশোয়ারে চলে যান।
পেশোয়ারে আব্দুল্লাহ আযাযাম ও তাঁর প্রিয় বন্ধু উসামা বিন লাদেন বায়তুল আনসার (মুজাহিদীনদের সেবা সংস্থা) এর সন্ধান পান। যারা আফগান জিহাদের জন্য সমস্ত প্রকার সাহায্য সহযোগিতা করতে প্রস্তুত ছিল। এই সংস্থা অনেক নতুন মুজাহিদীনকে পাকিস্তানে প্রশিক্ষণ দান করতো যাতে তারা আফগানিস্তানে সম্মুখ কাতারে থেকে জিহাদ করতে পারে।
জিহাদের প্রচন্ড আকাঙ্খার কারণে শায়খ শুধু এটুকু করেই ক্ষ্যন্ত হননি বরং তিনি সরাসরি জিহাদের প্রথম কাতারেও শামিল হন এবং সাহসিকতার সাথে বীরের মত ভূমিকা পালন করেন।
আফগানিস্তানে তিনি একটি নির্দিষ্ট জায়গায় খুব সময়ই অবস্থান করতেন। তিনি গোটা দেশ সফর করেছেন; এর অধিকাংশ প্রদেশগুলো হচ্ছে, লোগার, কান্দাহার, হিন্দুকুশ পর্বতমালা, পাঞ্জসের উপত্যকা, কাবুল, জালালাবাদ। এই সফর করার কারণে তিনি আফগানিস্তানের সাধারণ যোদ্ধাদের সাথে পরিচিত হবার সুযোগ পান যারা আল্লাহর কালিমাকে প্রতিষ্ঠিত করার জন্য নিজেদের জীবন ও সম্পদ দ্বারা জিহাদে লিপ্ত ছিল।
সফর থেকে ফেরত আসার পর পেশোয়ারে তিনি নিরবিচ্ছিন্নভাবে জিহাদের ব্যাপারে খুতবা দিতে লাগলেন। তিনি বিভক্ত মুজাহিদীন নেতাদের ঐক্যবদ্ধ হওয়ার জন্য দুয়া করতেন এবং যারা এখন পর্যন্ত জিহাদের কাতারে শামিল

হয়নি ও আল্লাহর রাহে অস্ত্র তুলে নেয়নি খুব দেরি হওয়ার পূর্বেই তাদেরকে তাদের দায়িত্বে ফিরে আসার জন্য আহ্বান জানাতেন।

আফগান জিহাদ দ্বারা শাইখ আব্দুল্লাহ আয্যাম রহ. অত্যন্ত প্রভাবিত হয়েছিলেন, ঠিক একইভাবে আফগান জিহাদও তার দ্বারা সীমাহীন উপকৃত হয়েছিল। তিনি তাঁর পুরো সময় এই কাজের মধ্যেই নিয়োজিত থাকতেন। আফগান মুজাহিদ নেতাদের কাছে তাঁর ভূমিকা খুবই গুরুত্বপূর্ণ ছিল। মুসলিম উম্মাহকে আফগান জিহাদের বিষয়ে জাগ্রত করার জন্য তিনি তাঁর পক্ষে করা সম্ভব এমন কোন প্রচেষ্টাকেই বাকী রাখেন নি। তিনি সারা বিশ্বের প্রতিটি কোনায় সফর করেন এবং মুসলিমদের ভূমি ও দ্বীনকে হেফাজতের জন্য তাদেরকে ঘর থেকে বেরিয়ে আসার আহ্বান জানান। তিনি জিহাদের উপর অনেক বই লিখেছেন। যেমন 'এসো কাফেলাবদ্ধ হই', 'আফগান জিহাদে রহমান এর মুযিজাসমূহ', 'মুসলিম ভূমিসূমহের প্রতিরক্ষা', 'কারা জান্নাতের কুমারীদের ভালোবাসে?' ইত্যাদি।
তাঁর বয়স চল্লিশোর্ধ হয়ে যাওয়ার পরও জিহাদে অংশগ্রহণ অব্যাহত রেখেছিলেন। তিনি আফগানিস্তানের পূর্ব থেকে পশ্চিমে, উত্তর থেকে দক্ষিণে, বরফের এলাকায়, পাহাড়ে, গরম-ঠান্ডায়, গাধায় চলে, পায়ে হেঁটে সফর করেছেন। তাঁর সাথে কোন যুবক থাকলে ক্লান্ত হয়ে পড়তো। অথচ শাইখ ক্লান্ত হতেন না।

তিনি আফগানিস্তানের জিহাদের বিষয়ে মুসলিমদের দৃষ্টিভঙ্গিকে পরিবর্তন করেছেন এবং এই জিহাদ যে ইসলামের জন্য করা হচ্ছে তা সারাবিশ্বের মুসলিমদেরকে বুঝাতে সক্ষম হয়েছেন। তাঁর এই অক্লান্ত প্রচেষ্টার ফলে আফগান জিহাদ আর্ন্তজাতিক রুপ লাভ করে এবং এতে বিশ্বের প্রতিটি প্রান্ত থেকে মুসলিমরা অংশগ্রহণ করা শুরু করে। পূর্ব থেকে পশ্চিম ও উত্তর দক্ষিণ পৃথিবীর চতুর্দিক থেকে খুব দ্রুত ইসলামের সৈনিকরা তাদের জিহাদের ফরজিয়াত আদায় এবং নির্যাতিত মুসলিম ভাই ও বোনদেরকে রক্ষা করার জন্য এগিয়ে আসতে থাকে।
শাইখের জীবন আবর্তিত ছিল একটি মাত্র বিষয়কে কেন্দ্র করে, আর তা ছিল আল্লাহর হুকুমকে এই জমীনের বুকে প্রতিষ্ঠিত করা, যা প্রতিটি মুসলিম জীবনের লক্ষ্য হওয়া উচিত। তাঁর সারা জীবনের একমাত্র মহৎ লক্ষ্য ছিলো জিহাদের মাধ্যমে খিলাফার পুণঃপ্রতিষ্ঠা করা। তিনি বিশ্বাস করতেন যে, পৃথিবীর বুকে খিলাফাহ প্রতিষ্ঠার পূর্ব পর্যন্ত জিহাদ চালিয়ে যেতে হবে যাতে সারা বিশ্বব্যাপী ইসলামের আলো জ্বলে উঠে।
তিনি এ কাজে তাঁর পরিবারকেও উৎসাহিত করতেন। যার ফলশ্রুতিতে তার স্ত্রীকে দেখা যেত ইয়াতীমদের সেবা এবং অন্যান্য মানুষের দুঃখ-দূর্দশায় সহযোগিতামূলক কাজে নিয়োজিত থাকতে। তিনি অনেক বারই বিশ্ববিদ্যালয়ে

শিক্ষকতার প্রস্তাবকে প্রত্যাখ্যান করেছিলেন এবং বলতেন, তিনি ততক্ষণ পর্যন্ত জিহাদ চালিয়ে যাবেন যতক্ষণ পর্যন্ত হয় তিনি শহীদ হবেন নতুবা তাকে হত্যা করা হবে। ফিলিস্তিনকে মুক্ত করা তাঁর চূড়ান্ত লক্ষ্য হলেও আফগান জিহাদকে তিনি এতই ভালোবেসেছিলেন যে প্রায়ই একটি কথা পুনরাবৃত্তি করে বলতেন, "তিনটি অবস্থা ব্যতীত আমি কখনো জিহাদের ভূমি ত্যাগ করব না; হয় আমি আফগানিস্তানে নিহত হব, নতুবা পেশোয়ারে নিহত হব নতুবা আমার হাতা বাঁধা অবস্থায় পাকিস্তান থেকে বহিস্কৃত হব।"

বিংশ শতাব্দিতে আফগানিস্তানের জিহাদের মাধ্যমে শাইখ আব্দুল্লাহ আয্যাম রহ. জিহাদের একটি গুরুত্বপূর্ণ স্তম্ভ হয়ে উঠেন। তিনি মুসলিমদের হৃদয়কে জিহাদ এবং প্রয়োজনীয় বিষয়ে দারুণভাবে নাড়া দিতে সক্ষম হয়েছেন, তা জিহাদে অংশগ্রহণের মাধ্যমে অথবা উদ্বুদ্ধ করার মাধ্যেমে কিংবা জিহাদের বিষয়ে ছুড়ে দেয়া ভ্রান্ত ধারণাগুলোকে দূর করার মাধ্যমেই হোক না কেন। তরুণ প্রজন্মকে জিহাদের পথে আহ্বানের মাধ্যমে তিনি আলেমদের নিকট এক অনুসরণীয় দৃষ্টান্ত রেখে গেছেন। তিনি জিহাদ এবং এর যে কোন প্রয়োজনীয়তাকে খুব গুরুত্বের সাথে মূল্যায়ন করতেন। একদিন তিনি বলেছিলেন, "আমি মনে করি আমার প্রকৃত বয়স হচ্ছে নয় বছর, সাড়ে সাত বছর কেটেছে আফগান জিহাদে আর দেড় বছর কেটেছে ফিলিস্তিন জিহাদে, এছাড়া আমার কাছে আমার জীবনের বাকী বয়সগুলোর কোন মূল্য নেই।"

মিম্বারে দাঁড়িয়ে খুতবা দেওয়ার সময় প্রায়ই তিনি অত্যন্ত দৃঢ়তার সাথে বলতেন, "জিহাদ পরিত্যাগ করা হবে না, যতক্ষণ পর্যন্ত এক আল্লাহর ইবাদত করা হয়। এই জিহাদ চলতে থাকবে যতক্ষণ পর্যন্ত না আল্লাহর কালিমাকে সবার উপরে তোলা হয়। জিহাদ চলবে যতক্ষণ পর্যন্ত না সকল নির্যাতিত মানুষ মুক্ত হয়। জিহাদ চলবে আমাদের সম্মান ও দখলকৃত ভূমিগুলো ফিরিয়ে আনার আগ পর্যন্ত। জিহাদ হচ্ছে চিরস্থায়ী মর্যাদার পথ।"

যারা শাইখ আব্দুল্লাহ আয্যাম রহ. কে পূর্ব থেকে চিনতেন তারা সবাই অতীত ইতিহাসের আলোকে তাঁর ব্যাপারে সাক্ষ্য দিয়েছেন যে, তিনি ছিলেন অত্যন্ত সাহসী বক্তা। শাইখ আব্দুল্লাহ আয্যাম রহ. মুসলিম উম্মাহকে উপলক্ষ্য করে খুতবা দেয়ার সময় বলতেন যে, "মুসলিমরা কখনোই অপর জাতির দ্বারা পরাজিত হয় না। আমরা মুসলিমরা কখনোই আমাদের শত্রুদের কাছে পরাজিত হই নি, কিন্তু আমরা পরাজিত হয়েছি আমাদের নিজেদের লোকদের কাছে। জাতির নিকৃষ্ট মুনাফিক ও গাদ্দারদের কাছে।"
তিনি ছিলেন একজন উত্তম ব্যক্তিত্বের অধিকারী। ধর্মানুরাগ, আল্লাহর প্রতি নির্ভরশীলতা এবং সংযমশীলতা ছিলো তাঁর চারিত্রিক অলংকার। তিনি কখনোই কারো সাথে মন্দ আচরণ দেখাতেন না। শাইখ আয্যাম রহ. সব

সময় তরুণদের কথা মনোযোগ দিয়ে শুনতেন; তিনি তাদেরকে সম্মান করতেন এবং সকল প্রকার ভয়-ভীতিকে অতিক্রম করে তাদের হৃদয়ের সুপ্ত সাহসিকতাকে জাগিয়ে তুলতেন।
তিনি অবিরাম সিয়াম পালন করতেন; বিশেষ করে দাউদ (আলাইহি ওয়া সাল্লাম) -এর সুন্নাহ্ অর্থাৎ একদিন সিয়াম পালন করা এবং একদিন বিরত থাকা, এই নীতিতে তিনি সিয়াম পালন করতেন। তিনি অন্যদের সোম এবং বৃহস্পতিবার দিন সিয়াম পালন করার বিষয়ে খুব বেশি তাগিদ দিতেন। শাইখ ছিলেন একজন ন্যায়বান, সৎ মানুষ এবং তিনি কখনো কোন মুসলিমের সাথে খারাপ ভাষায় অথবা কষ্ট দিয়ে কথা বলতেন না।

আফগান জিহাদ চলাকালীন সময়ে তিনি সেখানকার বিভিন্ন মুজাহিদ দলকে একত্রিত করতে সক্ষম হয়েছিলেন। স্বভাবতইঃ মুসলিমদের এই সফলতা দেখে ইসলামের শত্রুরা নিদারুণ যন্ত্রণা অনুভব করতে লাগল এবং তারা তাঁর বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্র শুরু করল।
১৯৮৯ সালের নভেম্বর মাসের ঘটনা। তিনি যেই মিম্বারে উঠে নিয়মিত জুম'আর খুতবা দিতেন তার নিচে একটি মারাত্মক শক্তিশালী টি,এন,টি বিস্ফোরক রাখা হয়েছিল। এটি এতই ভয়াবহ ছিল যে, এটি বিস্ফোরিত হলে মসজিদের ভিতরস্থ সকল মানুষ নিয়ে পুরো মসজিদটিই ধ্বসে যেতে পারতো। কিন্তু আল্লাহ যাঁকে বাঁচিয়ে রাখতে চান তাঁকে মারার ক্ষমতা কার আছে? অলৌকিকভাবে বিস্ফোরকটি তখন বিস্ফোরিত হয়নি।

শত্রুরা তাদের ষড়যন্ত্রকে বাস্তবায়নের জন্য দৃঢ় প্রতিজ্ঞ ছিল, তাই তারা কিছুদিন পরে ঠিক একই বছরে পেশোয়ারে আবারও তাদের দুষ্কর্ম বাস্তবায়নের চেষ্টা চালায়। আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলা যখন সিদ্ধান্ত নিলেন যে, শাইখ আব্দুল্লাহ আয্যাম রহ. - কে এই দুনিয়া থেকে তুলে নিয়ে তার সৎকর্মশীল বান্দাদের সাথে রাখবেন (আমরা তার ব্যাপারে এরূপ ধারণাই করে থাকি), তিনি তাঁর মহৎ ব্যক্তিত্বের সাথে আখিরাতের দিকে প্রত্যাবর্তন করলেন। দিনটি ছিল ১৯৮৯ সালের ২৪শে নভেম্বর, শুক্রবার এবং সময় ছিল বেলা ১২:৩০।

শত্রুরা তিনটি বোমা রাস্তার পাশে পুঁতে রেখেছিল আর রাস্তাটি এতই সরু ছিল যে, সেখান দিয়ে একটি গাড়ির বেশি অতিক্রম করতে পারত না। শাইখ আব্দুল্লাহ আয্যাম রহ. এই রাস্তা দিয়ে প্রতি শুক্রবার জুম'আর সালাত আদায় করতে যেতেন। সেদিন শাইখ, তাঁর দুই পুত্র ইবরাহীম এবং মুহাম্মাদকে সাথে নিয়ে যাচ্ছিলেন এবং তাঁর আরেক সন্তান তামিম আদনানী (যিনি প্রসিদ্ধ আলিম ও আফগান জিহাদের আরেকজন বীর মুজাহিদ ছিলেন) একাকী অন্য আরেকটি গাড়িতে করে আসছিলেন। প্রথম বোমাটি যেখানে পুঁতে রাখা হয়েছিল ঠিক সেই জায়গাতেই গাড়িটি থামানো হলো এবং শাইখ গাড়ি থেকে নেমে হাটা

শুরু করলেন আর তখনই শত্রুদের বোমাটি মারাত্মক বিকট শব্দ নিয়ে বিস্ফোরিত হলো যার আওয়াজ পুরো শহরবাসী শুনতে পেয়েছিল।

মসজিদ এবং আশপাশ থেকে মানুষ ঘটনাস্থলে দৌড়ে আসলো। সেখানে গাড়ির বিক্ষিপ্ত কিছু টুকরো ছাড়া আর কিছুই তারা দেখতে পেল না। তার ছোট পুত্রের দেহ বিস্ফোরণের ফলে ১০০ মিটার আকাশের উপরে উঠে গিয়েছিল, বাকী দুজনের দেহও একই পরিমাণের উচ্চতায় উপরে উঠে গিয়েছিল এবং তাদের দেহের বিভিন্ন অংশ গাছ এবং বৈদ্যুতির তারের সাথে ঝুলন্ত অবস্থায় পাওয়া গিয়েছিল। আর শাইখ আব্দুল্লাহ আয্যাম রহ. এর দেহটি ছিলো অক্ষত শুধুমাত্র মুখ দিয়ে কিছু রক্ত প্রবাহিত অবস্থায় একটি দেয়ালের সাথে হেলানো অবস্থায় পাওয়া গেল।

ঐ চরম বিস্ফোরণের মাধ্যমেই শাইখ আব্দুল্লাহ আয্যাম রহ. এর দুনিয়ার যাত্রার পরিসমাপ্তি ঘটে -যিনি তাঁর জীবনের অধিকাংশ সময়ই আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলার পথে জিহাদ করার মাধ্যমে কাটিয়েছিলেন। এর মাধ্যমে তাঁর জন্য জান্নাতের বাগান আরো সুনিশ্চিত হয়ে যায়। আমরা আল্লাহ তা'আলার নিকট প্রার্থনা করি, যেন তিনি তাঁকে শহীদ হিসেবে কবুল করে নেন এবং তাঁর সম্মানিত বান্দাদের সাথে থাকার সুযোগ দান করেন। যেমনটি মহান আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলা নিজেই বলেছেন,

وَمَنْ يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ فَأُولَئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ مِنَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّيقِينَ وَالشُّهَدَاءِ وَالصَّالِحِينَ وَحَسُنَ أُولَئِكَ رَفِيقًا.

অর্থ: "আর যাঁরা আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের আনুগত্য করে আল্লাহর অনুগ্রহপ্রাপ্ত বান্দাদের সাথেই থাকবে - (আল্লাহর অনুগ্রহপ্রাপ্ত বান্দা হলেন) নবী, সিদ্দীক, শহীদ ও সৎকর্মশীলদের মধ্য থেকে। আর সাথী হিসেবে তারা হবে উত্তম।"[১]

আর এভাবেই এই মহান শাইখ এবং জিহাদকে পুনঃজীবিতকারী, জিহাদের ভূমি এবং এই দুনিয়াকে ছেড়ে চলে যান, যিনি আর কখনো ফিরে আসবেন না। তাঁকে পেশোয়ারে শহীদদের কবরস্থান পাবীতে কবর দেয়া হয়। যেখানে তাঁকে আরো শতাধিক শহীদদের মাঝে শায়িত করা হয়। আল্লাহ তা'আলা তাঁর শাহাদাতকে কবুল করুন এবং তাঁকে জান্নাতের সবচেয়ে উঁচু মর্যাদা দান করুন।

ইসলামের শত্রুদের বিভিন্ন বাঁধা-বিপত্তির পরেও তিনি বিভিন্ন দেশে তাঁর জিহাদের প্রচেষ্টাকে অব্যাহত রেখেছিলেন। তাই বিংশ শতাব্দিতে এমন কোন জিহাদের ভূমি পাওয়া যায় নি অথবা এমন কোন মুজাহিদ দেখা যায় নি যিনি

---

[১] সূরা নিসা, আয়াত ৬৯।

শাইখ আব্দুল্লাহ আয্‌যাম রহ.- এর জীবনী, শিক্ষা অথবা তাঁর কাজ দ্বারা উদ্বুদ্ধ না হয়েছেন।
বিংশ শতাব্দিতে তাঁর জীবনের ১৯৭৯-৮৯ এই দশ বছরের সময়কালটি ইসলামের ইতিহাসে স্বর্ণাক্ষরে লিপিবদ্ধ হয়ে আছে। একদা শাইখ আব্দুল্লাহ আয্‌যাম রহ. নিজেই বলেছিলেন, "ইসলামের ইতিহাস শহীদদের রক্ত, স্মৃতি এবং দৃষ্টান্ত ছাড়া লেখা যায় না।"

আমরা আল্লাহ তা'আলার নিকট প্রার্থনা করি, যেন তিনি শাইখ আব্দুল্লাহ আয্‌যাম রহ. এর সকল প্রচেষ্টাগুলোকে কবুল করে নেন এবং তাঁকে জান্নাতের সবচেয়ে উঁচু মর্যাদা দান করেন।
আমরা আল্লাহ তা'আলার নিকট আরো প্রার্থনা করি যেন তিনি এই উম্মতের জন্য শায়খের মতো মহৎ চরিত্রের আরো আলিম দান করেন -যারা এই উম্মাহকে জাগিয়ে তুলবেন।
আল্লাহ আমাদের সকলকে তাঁর দীনের জন্য কবুল করুন। আমীন।

عن كَعْبِ بنِ عُجرَةَ قالَ: " قَالَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: اسْمَعُوا هَلْ سَمِعْتُمْ أَنَّهُ سَيَكُونُ بَعْدِي أُمَرَاءُ فَمَنْ دَخَلَ عَلَيْهِمْ فَصَدَّقَهُمْ بِكَذِبِهِمْ وَأَعَانَهُمْ عَلَى ظُلْمِهِمْ فَلَيْسَ مِنِّي وَلَسْتُ مِنْهُ وَلَيْسَ بِوَارِدٍ عَلَيَّ الْحَوْضَ وَمَنْ لَمْ يَدْخُلْ عَلَيْهِمْ وَلَمْ يُعِنْهُمْ عَلَى ظُلْمِهِمْ وَلَمْ يُصَدِّقْهُمْ بِكَذِبِهِمْ فَهُوَ مِنِّي وَأَنَا مِنْهُ وَهُوَ وَارِدٌ عَلَيَّ الْحَوْضَ".

হযরত কা'ব ইবনে উজরত রা. থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন প্রিয়নবী সা. আমাদের কাছে এসে বললেন, জেনে রাখো আমার পর অচিরেই অনেক জালিম শাসক আসবে। যারা সেই সকল শাসকদের সাথে আঁতাত করবে, তাদের অন্যায়গুলোকে সমর্থন দিবে এবং তাদের জুলুমে সহযোগিতা করবে, সে আমার উম্মত নয় এবং আমিও তার দায়িত্ব নিবো না এবং (কিয়ামতের দিন) তাকে আমার হাউজে কাউসারের সামনে আসতে দেয়া হবে না। আর যাঁরা সেই সকল জালিম শাসকদের সাথে আঁতাত করবে না, তাদের জুলুমে সহায়তা করবে না বরং তাদের অন্যায়সমূহের বিরোধিতা করবে তাঁরা আমার উম্মত এবং আমি তাঁদের দায়িত্ব নিবো এবং তাঁদেরকেই (কিয়ামতের দিন) হাউজে কাউসারের পানি পান করানো হবে।" (সহীহ তিরমিজি, হাদীস নং ২২৯৫, নাসায়ী)

সূচীপত্র

শায়খ আব্দুল্লাহ আযযাম সম্পর্কে কিছু ঐতিহাসিক উক্তি

"শাইখ আব্দুল্লাহ আয্‌যাম রহ. একক কোন ব্যক্তি ছিলেন না, বরং তিনি ছিলেন একাই পুরো একটি উম্মত। তাঁর শাহাদাতের পরে মুসলিম মায়েরা তার মত দ্বিতীয় একটি সন্তানকে জন্ম দিতে ব্যর্থ হয়েছেন।" (-শাইখ উসামা বিন লাদেন রহ., আল-জাজিরা টিভি চ্যানেলের সাক্ষাতকার, ১৯৯৯।)

"বিংশ শতাব্দীতে জিহাদের পূন:জাগরণে তিনিই দায়ী।"-টাইম ম্যাগজিন।

"তাঁর কোন কথা সাধারণ মানুষের কথা ছিল না, তাঁর কথা খুবই অল্প কিন্তু এর অর্থ ছিল অত্যন্ত গভীর। যখন আমরা তাঁর চোখের দিকে তাকাতাম, তখন আমাদের অন্তর ঈমান এবং আল্লাহর প্রতি ভালোবাসায় পরিপূর্ণ হয়ে যেত।" [মক্কা থেকে একজন মুজাহিদ আলেম]

বর্তমান বিশ্বে এমন কোন জিহাদের ভূমি অথবা আল্লাহর পথে যুদ্ধরত মুজাহিদ নেই, যিনি শাইখ আব্দুল্লাহ আয্‌যাম রহ.- এর জীবনী, শিক্ষা এবং তাঁর কাজের দ্বারা প্রভাবিত না হয়েছেন।" [আয্‌যাম পাবলিকেশন্স]
১৯৮০ -এর দশকে শহীদ শাইখ আব্দুল্লাহ আয্‌যাম রহ. ছিলেন এমন এক মুদ্রিত নাম, যার কথা চেচনিয়ার জিহাদের ময়দানগুলোতে আজও বার বার প্রতিধ্বণিত হয়ে চলছে। তিনি মুজাহিদীনদের ব্যাপারে বলতেন, যে জিহাদের ময়দানে মারা গেল সে যেন শরীক হল শহীদী কাফেলার সাথে। [ইবনুল খাত্তাব রহ. -চেচনিয়ার মহান মুক্তিযোদ্ধা]

يُرِيدُونَ أَنْ يُطْفِئُوا نُورَ اللَّهِ بِأَفْوَاهِهِمْ وَيَأْبَى اللَّهُ إِلا أَنْ يُتِمَّ نُورَهُ وَلَوْ كَرِهَ الْكَافِرُونَ. هُوَ الَّذِي أَرْسَلَ رَسُولَهُ بِالْهُدَى وَدِينِ الْحَقِّ لِيُظْهِرَهُ عَلَى الدِّينِ كُلِّهِ وَلَوْ كَرِهَ الْمُشْرِكُونَ.

অর্থ: "তারা তাদের মুখের ফু দিয়ে আল্লাহর নূরকে নির্বাপিত করতে চায় কিন্তু আল্লাহ তো তাঁর নূর পরিপূর্ণ করা ছাড়া অন্য কিছু চান না, - কাফিররা এটা যতই অপছন্দ করুক না কেন। তিনিই তাঁর রাসূলকে হিদায়াত ও সত্য দীনসহ প্রেরণ করেছেন, যাতে তিনি একে সকল দীনের উপর বিজয়ী করেন, যদিও মুশরিকরা অপছন্দ করে।" (সূরা তাওবা, আয়াত ৩২-৩৩)

ভূমিকা

إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا.

সকল প্রশংসা আল্লাহ তা'আলার জন্য। আমরা তাঁরই প্রশংসা করি এবং তাঁর কাছেই সাহায্য প্রাথনা করি। আমরা তাঁর নিকট ক্ষমা প্রার্থনা করি এবং আশ্রয় চাই আমাদের খারাপ আমল ও নফসের খারাবী থেকে। আল্লাহ তা'আলা যাকে হিদায়াত দান করেন কেউ তাকে গোমরাহ করতে পারে না। আর তিনি যাকে গোমরাহীর মধ্যে নিক্ষিপ্ত করেন কেউ তাকে হিদায়াত দান করতে পারে না। আমি সাক্ষ্য দিচ্ছি যে, আল্লাহ ছাড়া কোন ইলাহ নেই, তিনি একক, তাঁর কোন শরীক নেই এবং আমি আরো সাক্ষ্য দিচ্ছি যে, মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাঁর দাস এবং রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম।
হে আমার রব! কোন কিছুই সহজ নয় (তা ছাড়া) শুধুমাত্র আপনি যার জন্য তা সহজ করে দেন এবং আপনি যখন চান তখন তখন অন্ধকারের ভিতরেও আলো দান করেন।

আমি যখন এই ফাতাওয়াটি লিখি তখন এটি বর্তমানের আকারের চেয়ে আরো বড় ছিল। আমি এটিকে আমাদের সম্মানিত শাইখ আব্দুল আজিজ বিন বাজকে দেখাই। আমি তার সামনে ফাতাওয়াটি পড়ি; এবং তিনি পুরো ফাতাওয়াটি শুনে এর সাথে একমত পোষণ করেন এবং বলেন এটি খুব ভাল। তবে তিনি আমাদের উপদেশ দেন ফাতাওয়াটি আরো সংক্ষিপ্ত করার জন্য এবং এর শুরুতে একটি ভূমিকা দেয়ার জন্য যখন এটি প্রকাশ করা হবে। পরবর্তীতে তিনি ব্যস্ত হয়ে পরেন কারণ তখন ছিল হজ্জের মৌসুম, তাই এটি আর দ্বিতীয়বারের মত তাকে দেখাতে পারি নি।[২]
এরপর শাইখ বিন বাজ জেদ্দায় বিন লাদেন মসজিদে এবং রিয়াদের একটি বড় মসজিদে খুতবা দেয়ার সময় ঘোষণা দেন যে বর্তমান জিহাদ হচ্ছে

---

[২] ১৯৯ সালে এই কিতাবটি যখন লিখা শেষ হয়েছিলো তখন শাইখ বিন বাজ ইন্তেকাল করেছিলেন।

প্রত্যেকের জন্য ফরজে আইন। অতঃপর আমি এই ফাতাওয়াটির শেষে ছয়টি প্রশ্ন ছাড়া বিশিষ্ট শাইখ আব্দুল্লাহ আল ওয়ান, প্রভাষক সাঈদ হাউয়া, মুহাম্মান নাজীব আল-মুত'ঈী, ড. হাসান হামিদ হিসান এবং উমার সাইফ প্রমূখদের দেখাই। আমি তাদের সম্মূখে এটি পড়ে শুনাই এবং তাদের সবাই এতে একমত পোষণ করেন এবং এতে স্বাক্ষর করেন। এছাড়াও আমি শাইখ আব্দুর রাজ্জাক আফিফ্ফী, হাসান আইউব এবং ড. আহমেদ আল-আশাল এর সামনেও এটিকে পড়ে শুনিয়েছিলাম।

এরপর আমি হজ্জের মৌসুমে একটি খুতবা দেই সাধারণ পথনির্দেশনা সেন্টারের মধ্যে যা মিনায় অবস্থিত। সেখানে ইসলামী দেশগুলো থেকে প্রায় একশ'রও বেশি আলিম উপস্থিত ছিলেন। সেখানে আমি বলেছিলাম,
"এ ব্যাপারে পূর্ববর্তী সত্যানিষ্ঠ আলিমগণ" একমত পোষণ করেছেন এবং সকল যুগের মুহাদ্দিসগণ উপলব্ধি করেছেন যে, যদি মুসলিমদের ভূমির এক বিঘত পরিমাণ জায়গাও কুফ্ফাররা দখল করে নেয়, তখন প্রত্যেক মুসলিম নর-নারীর উপর জিহাদ করা ফরজে আইন (সবার জন্য ফরজ) হয়ে যায়। ঐ মুহুর্তে জিহাদে বের হওয়ার জন্য সন্তানের প্রয়োজন হয় না তার পিতা-মাতার কাছ থেকে অনুমতি নেয়া এবং স্ত্রীরও তার স্বামীর কাছে থেকে অনুমতি নেয়ার প্রয়োজন হয় না।"

আমি আমিরুল জিহাদের (সাইয়াফ)- অধীনে ৩ বছর সময় আফগানিস্তানে জিহাদে কাটিয়ে এসেছি এবং আমি সেখানে জনশক্তির প্রয়োজনীয়তা অনুভব করেছি। সুতরাং এ বিষয়ে যদি কোন মত পার্থক্য থাকে, হে উলামা শাখায়েখগণ! তাহলে দাঁড়িয়ে যেতে পারেন। সেখানে একজনও দ্বিমত পোষণ করেন নি। এমতাবস্থায় ড. জাফর শাইখ ইদ্রীস উঠে বললেন, হে আমার ভাই! এ বিষয়ে আমাদের কোন দ্বিমত নেই।

অবশেষে আমি এই ফাতাওয়াটি প্রকাশ করি। আল্লাহ তা'আলা এই কিতাবটির মাধ্যমে মুসলিমদেরকে এই দুনিয়া ও আখিরাতের সমস্ত কল্যাণ এনে দিতে পারেন।

-আব্দুল্লাহ আযযাম।

১ম অধ্যায়ঃ
ঈমান আনার পর প্রথম ফরজ দায়িত্ব

সকল প্রশংসা আল্লাহ তা'আলার জন্য। আমরা তাঁরই প্রশংসা করি এবং তাঁর কাছেই সাহায্য প্রার্থনা করি। আমরা তাঁর নিকট ক্ষমা প্রার্থনা করি এবং আশ্রয় চাই আমাদের খারাপ আমল ও নফসের খারাবী থেকে।

আল্লাহ তা'আলা যাকে হিদায়াত দান করেন তাকে কেউ গোমরাহ করতে পারে না। আর তিনি যাকে গোমরাহীর মধ্যে নিক্ষিপ্ত করেন কেউ তাকে হিদায়াত দান করতে পারে না। আমি সাক্ষ্য দিচ্ছি যে, আল্লাহ ছাড়া কোন ইলাহ নেই, তিনি একক, তার কোন শরীক নেই এবং আমি আরো সাক্ষ্য দিচ্ছি যে, মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তার দাস এবং রাসুল। আল্লাহ তার উপর, তার পরিবার ও সাহাবী (রাদিআল্লাহু আনহুম)গণের উপর শান্তি বর্ষণ করুন।

অতপর...

আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলা এই দ্বীন (ইসলাম) -কে সমস্ত বিশ্ববাসীর উপর দয়া স্বরূপ পছন্দ করেছেন। তিনি এই দ্বীনের জন্য সর্বশেষ নবীকে পাঠিয়েছেন যিনি রাসূলদের মধ্যে সবচেয়ে বেশি রহমতপ্রাপ্ত। তাঁকে পাঠানো হয়েছে তীর ও বর্শার দ্বারা এই দ্বীনকে বিজয়ী করে তোলার জন্য; যখন এটি সবার নিকট সুস্পষ্ট দলীল ও যুক্তির দ্বারা পরিস্কার হয়ে যায়। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন,

بعثت بين يدي الساعة بالسيف حتى يعبد الله تعالى وحده لا شريك له، وجعل رزقي تحت ظل رمحي وجعل الذل والصغار على فن خالف أمري، ومن تشبه بقوم فهو منهم.

অর্থঃ "আমাকে উত্থিত করা হয়েছে কিয়ামতের আগে তলোয়ার সহকারে যতক্ষণ পর্যন্ত না শিরকমুক্ত অবস্থায় এক আল্লাহর ইবাদাত করা হয়। তিনি আমার রিজিক রেখেছেন বর্শার ছায়ার নিচে এবং যারা আমার আদেশ প্রত্যাখ্যান করবে তাদের জন্য রয়েছে অবমাননা ও লাঞ্ছনা, যা নির্ধারিত

হয়েছে আল্লাহর পক্ষ হতে এবং যে তাদের (কাফিরদের) অনুসরণ করবে সে তাদের অন্তর্ভূক্ত।”[৩]

এভাবেই সর্বশক্তিমান আল্লাহ তা'আলা এই বিধানকে মানবজাতির উপর অনুগ্রহ স্বরূপ দান করেছেন এবং এটিকে দ্ব্যার্থহীন করে দিয়েছেন। অন্য কথায়, মানবজাতির পূর্ণগঠনের জন্যই সত্য-মিথ্যার এই দ্বন্দ্ব চলতে থাকবে, যেন সত্য সদা প্রবল হয় এবং যা কিছু উত্তম তা বিস্তার লাভ করে। এর আরও একটি উদ্দেশ্য হল মুমিনদের আমল এবং ইবাদাতের স্থানগুলোকে নিরাপদ রাখা। আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলা বলেন,

وَلَوْلَا دَفْعُ اللَّهِ النَّاسَ بَعْضَهُمْ بِبَعْضٍ لَهُدِّمَتْ صَوَامِعُ وَبِيَعٌ وَصَلَوَاتٌ وَمَسَاجِدُ يُذْكَرُ فِيهَا اسْمُ اللَّهِ كَثِيرًا وَلَيَنْصُرَنَّ اللَّهُ مَنْ يَنْصُرُهُ إِنَّ اللَّهَ لَقَوِيٌّ عَزِيزٌ.

অর্থঃ “আল্লাহ্ যদি মানবজাতির একদলকে অপর দল দ্বারা প্রতিহত না করতেন, তবে গির্জা, ইবাদত খানা, (ইহুদীদের) উপাসনালয় এবং মসজিদসমূহ বিধ্বস্ত হয়ে যেত, যেগুলোতে আল্লাহ্র নাম অধিক স্মরণ করা হয়। আল্লাহ্ নিশ্চয়ই তাদেরকে সাহায্য করবেন, যারা আল্লাহ্কে সাহায্য করে। নিশ্চয়ই আল্লাহ্ পরাক্রমশালী, শক্তিধর।”[৪]

প্রতিরক্ষা অথবা জিহাদের বিধি-বিধান ও কৌশল সম্পর্কে আল্লাহর কিতাবের বিভিন্ন স্থানে উল্লেখ করা হয়েছে যাতে আমরা বুঝতে পারি যে, সত্যের নিজস্ব একটা শক্তি আছে যা দ্বারা সে নিজেকে টিকিয়ে রাখে। এখন প্রশ্ন হল যে, আর কতকাল এই সত্য (দ্বীন) পরাজিত হতে থাকবে এর বাহকদের অবহেলার কারণে? আর কত দিন মিথ্যা (অন্যান্য দ্বীনগুলো) বিজয়ী হবে তাদের সাহায্যকারীদের উৎসর্গের কারণে?

জিহাদ দু'টি প্রধান স্তম্ভের উপর প্রতিষ্ঠিত। আর তা হল ধৈর্য এবং মহত্ব। ধৈর্য্য এমন একটি গুণ যার দ্বারা আত্মার সাহসিকতা প্রকাশ পায় এবং মহত্ব কাউকে তার সম্পদ ও জানকে আত্মত্যাগ করতে শেখায়। আত্মত্যাগ যার মধ্যেই থাকুক না কেন এটি হচ্ছে একটি মহৎ গুণ যেমনটি হাদীসে বর্ণিত হয়েছে, রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন,

الإيمان الصبر والسماحة.

---

[৩] মুসনাদে আহমাদ, তাফসীরে তবারানী, সহীহ জামিউস সগীর, হাদীস নং ২৮২৮।

[৪] সূরা হজ্ব, আয়াত ৪০।

অর্থ: "ঈমান হল ধৈর্য্য ও মহত্ত্ব।"[৫]

ইবনে তাইমিয়্যাহ রহ. বলেন, "ধৈর্য্য ও মহত্ত্ব ব্যতীত বনী আদমের দ্বীন এবং দুনিয়াবী বিষয় সংশোধন হবে না।[৬]

মহান আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলা এই বিষয়টিকে আরো পরিস্কারভাবে জানিয়েছেন, যে কেউ জিহাদ ত্যাগ করবে তিনি তদস্থলে অন্য এমন কাউকে নিয়ে আসবেন, যারা এই কাজটি সম্পাদন করবে। মহান আল্লাহ বলেন,

إِلَّا تَنْفِرُوا يُعَذِّبْكُمْ عَذَابًا أَلِيمًا وَيَسْتَبْدِلْ قَوْمًا غَيْرَكُمْ وَلَا تَضُرُّوهُ شَيْئًا وَاللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ.

অর্থ: "যদি তোমরা জিহাদে না বের হও তবে আল্লাহ তোমাদের মর্মন্তুদ **আযাব দেবেন** এবং অপর জাতিকে তোমাদের স্থলাভিষিক্ত করবেন। তোমরা **তাঁর কোন ক্ষতি** করতে পারবেনা, আর আল্লাহ সর্ববিষয়ে শক্তিমান।"[৭]

নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামও **দু'টি পাপের উৎসকে** উল্লেখ করেছেন, **কৃপণতা ও কাপুরুষতা। এই উৎস দু'টি আত্মাকে কলু**ষিত করে এবং সমাজের **নৈতিক অবনতি ঘটায়। সহীহ হাদীসে** বর্ণিত আছে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু **আলাইহি ওয়া সাল্লাম** বলেছেন,

شر ما في رجل شح هالع وجبن خالع.

অর্থ: "মানুষের মধ্যে সবচেয়ে খারাপ দিক হল কৃপণতা ও কাপুরুষতা।"[৮]

আমরা যদি অতীতের দিকে তাকাই তাহলে দেখতে পাবো আমাদের পূর্ববর্তী **আলিমগণ** জিহাদের বিধানকে আঁকড়ে ছিলেন এবং মানব জাতিকে এরই মাধ্যমে শিক্ষা এবং নেতৃত্ব দান করেছিলেন।

আল্লাহ তা'আলা বলেন,

وَجَعَلْنَا مِنْهُمْ أَئِمَّةً يَهْدُونَ بِأَمْرِنَا لَمَّا صَبَرُوا وَكَانُوا بِآيَاتِنَا يُوقِنُونَ.

অর্থ: "আর আমি তাদের মধ্য হতে নেতা মনোনীত করেছিলাম তাদেরকে যারা **আমার** নির্দেশ অনুসারে পথ প্রদর্শন করতো। যেহেতু তারা ধৈর্য্য ধারণ করেছিলো। আর তারা ছিলো আমার নিদর্শনাবলীতে দৃঢ় বিশ্বাসী।"[৯]

---

[৫] **মুসনাদে** আহমাদ, সহীহ।

[৬] **মাজমু**আ আল ফাতাওয়া ২৮/১৫৭।

[৭] **সূরা** তাওবাহ ৯:৩৮-৩৯।

[৮] **আবূ** দাউদ, বুখারী, সহীহ। সহীহ আল জামিয়া হাদীস ৩৬০৩।

হ হাদীসে বর্ণিত আছে, রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন,

صلاح أول هذه الأمة بالزهد واليقين ويهلك آخرها بالبخل والأمل.

"আমার উম্মতের প্রথম অংশ ঈমানের দৃঢ়তা ও সংযমের দ্বারা গঠিত ছিল আর শেষ অংশ কাপুরুষতা এবং কৃপণতার দ্বারা ধ্বংসপ্রাপ্ত হবে।"[১০]

গ্যবশতঃ এমন কিছু জাতি ছিল যারা মুসলমানদের উত্তরসূরী ছিল, তারা াহর বিধানকে অবহেলা করতো। তারা তাদের রবকে ভুলে গিয়েছিল, তাই র রবও তাদেরকে ভুলে গিয়েছিলেন এবং তারা ধ্বংসপ্রাপ্ত হয়েছিল। ন আল্লাহ বলেন,

فَخَلَفَ مِنْ بَعْدِهِمْ خَلْفٌ أَضَاعُوا الصَّلَاةَ وَاتَّبَعُوا الشَّهَوَاتِ فَسَوْفَ يَلْقَوْنَ غَيًّا.

: "তাদের পরে আসল এমন এক অসৎ বংশধর যারা সালাত বিনষ্ট করল ং কুপ্রবৃত্তির অনুসরণ করল। সুতরাং শীঘ্রই তারা জাহান্নামের শাস্তি প্রত্যক্ষ বে।"[১১]

া তাদের নফসের অনুসরণ করত এবং তাদের আমলের খারাপগুলোকে দের নিকট শোভনীয় করে তোলা হয়েছিলো। সহীহ হাদীসে বর্ণিত, রাসূল াল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন,

إن الله يبغض كل جعظري جو اظ، سخاب في الأسواق، جيفة بالليل حمار بالنـ

عالم بالدنيا، جاهل بالآخرة)

: "আল্লাহ তা'আলা পছন্দ করেন না প্রত্যেক স্বার্থান্বেষী, উদ্ধ্যত ব্যক্তিকে বাজারে লক্ষ্যহীনভাবে ঘুরে বেরায়, রাত্রিতে লাশের মতো ঘুমিয়ে থাকে ং দিনের বেলায় গর্দভের ন্যায় থাকে, দুনিয়াবী বিষয়ে অনেক অভিজ্ঞ হলেও খরাতের বিষয়ে থাকে একদম মূর্খ।"[১২]

়য়ে যাওয়া অবশ্য পালনীয় কর্তব্যের মধ্যে একটি কর্তব্য হলো জিহাদ। না এটি এখন আর মুসলিমদের মধ্যে দেখা যায় না। যেনো তারা এখন ার পানির উপর ভেসে যাওয়া ময়লার মতো হয়ে গেছে। যেমনটি মুহাম্মাদ াল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছিলেন,

---

রা সাজদা, আয়াত ২৪।
াহমাদ, তাবারানী, বায়হাকী -হাদীসটি সহীহ। সহীহ আল জামে, হাদীস নং ৩৭৩৯।
়রা মারয়াম, আয়াত ৫৯।
াহীহ আল জামিউস সাগীর, হাদীস নং ৩৭৩৯।

عَنْ ثَوْبَانَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ –صلى الله عليه وسلم– يُوشِكُ أَنْ تَدَاعَى عَلَيْكُمُ الأُمَمُ مِنْ كُلِّ أُفُقٍ كَمَا تَدَاعَى الأَكَلَةُ إِلَى قَصْعَتِهَا . قِيلَ يَا رَسُولَ اللهِ : فَمِنْ قِلَّةٍ يَوْمَئِذٍ ؟ قَالَ لاَ ، وَلَكِنَّكُمْ غُثَاءٌ كَغُثَاءِ السَّيْلِ يُجْعَلُ الْوَهَنُ فِي قُلُوبِكُمْ وَيُنْزَعُ الرُّعْبُ مِنْ قُلُوبِ عَدُوِّكُمْ لِحُبِّكُمُ الدُّنْيَا وَكَرَاهِيَتِكُمُ الْمَوْتَ.

অর্থ: হযরত সাওবান রা. থেকে বর্ণিত, মহানবী সা. বলেছেন, "এমন একটি সময় আসবে যখন (অমুসলিম) জাতিসমূহ একে অপরকে প্রতিটি অঞ্চল থেকে তোমাদের উপর আক্রমণ করার জন্য আহ্বান করতে থাকবে, যেভাবে খাবার ভর্তি পাত্রের দিকে (ক্ষুধার্ত ব্যক্তিরা ঝাপিয়ে পড়ে এবং) একে অপরকে (সেই খাবার গ্রহণে ঝাঁপিয়ে পড়ার জন্য) আহ্বান করে। একজন জিজ্ঞাসা করলেন যে, 'এটা কি এই কারণে হবে যে আমরা তখন সংখ্যায় কম হবো?'
তিনি বললেন- 'না, (তোমরা সংখ্যায় তখন অনেক থাকবে কিন্তু) তোমরা হবে বন্যার পানির উপর ভেসে যাওয়া ময়লার মতো। আল্লাহ তোমাদের অন্তরের মধ্যে 'ওয়াহন' ঢুকিয়ে দেবেন এবং তোমাদের শত্রুদের অন্তর থেকে তোমাদের প্রভাব ও ভয়কে উঠিয়ে নিবেন।' জিজ্ঞাসা করা হল, 'হে আল্লাহর রাসূল! 'ওয়াহন' কি?' তিনি বললেন, 'দুনিয়ার প্রতি ভালোবাসা আর (আল্লাহর পথে) মৃত্যুকে ঘৃণা করা।"[১৩]

কাফিরদের বিরুদ্ধে জিহাদ দুই ধরণের:

১। আক্রমণাত্মক জিহাদ (যেখানে শত্রুকে তার নিজ এলাকায় আক্রমণ করা হয়):

এক্ষেত্রে কাফিররা মুসলিমদের বিরুদ্ধে যুদ্ধের জন্য একত্রিত হয় না। এই জিহাদ তখন ফরযে কিফায়া হয়, যার জন্য প্রয়োজন হয় স্বল্প সংখ্যক (যথেষ্ট) মুমিনদের, যাতে তারা সীমানা রক্ষা এবং কুফ্ফারদের ভূমি আক্রমণ করতে পারে। আল্লাহর (দ্বীনের) শত্রুদের অন্তরকে ভীত-সন্ত্রস্ত করার জন্য বছরে অন্তত একবার একটি সৈন্যদলকে শত্রুদের ভূমিতে প্রেরণ করা উচিত। এটি হল ইমামের (খলীফার) দায়িত্ব যে, তিনি বছরে একবার অথবা দু'বার জিহাদের উদ্দেশ্যে একটি সৈন্যদল গঠন করবেন এবং তাদেরকে জিহাদের ময়দানে প্রেরণ করবেন। সর্বোপরি, এটি হল মুসলিম জনগোষ্টির উপর একটি দায়িত্ব

---

[১৩] (আবু দাউদ হাদীস নং - ৪২৯৭, আহমদ- হাদীস নং -২২৪৫ উত্তম সনদে 'কিত্বালের প্রতি ঘৃণা'- এই শব্দ সহকারে, বায়হাকী হাদীস নং -১০৩৭২)

য, তারা এই কাজে ইমামকে সহযোগীতা করবে আর তিনি যদি এই সৈন্যদল া প্রেরণ করেন; তাহলে তিনি গুনাহের মধ্যে লিপ্ত হবেন।[১৪]

এ ধরণের জিহাদের ব্যাপারে আলিমগণ বলেছেন, "আক্রমণাত্মক জিহাদ হল জিজিয়া আদায়ের জন্য।"

যে সকল আলিমগণ দ্বীনের শারঈ দিক সর্ম্পকে ইলম রাখেন তারাও বলেছেন, 'জিহাদ হল এমন একটা দাওয়া যার মধ্যে শক্তি আছে এবং এটি হল একটি আবশ্যিক দায়িত্ব যা সকল সম্ভাব্য উপায়ে বাস্তবায়ন করতে হবে যতক্ষণ পর্যন্ত না সেখানে শুধুমাত্র মুসলিমরা অথবা যারা আল্লাহর নিকট আত্মসমর্পণ করে তারাই অবস্থান করে।

২। আত্মরক্ষামূলক জিহাদঃ

এটি হল আমাদের ভূমি হতে কাফেরদের বের করে দেওয়া, যা ফরজে আইন, অর্থাৎ সবার জন্য আবশ্যকীয় কর্তব্য। সকল প্রকার আবশ্যকীয় কর্তব্যগুলোর মধ্যে এটি হল সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ যদি নিম্নের অবস্থানগুলো কেনোটি পরিদৃষ্ট হয়:

১) যদি কাফিররা মুসলিমদের ভূমিতে প্রবেশ করে।

২) যদি দুটি বাহিনী যুদ্ধের ময়দানে মুখোমুখি এসে দাঁড়ায় এবং একে অপরকে আহ্বান করতে শুরু করে।

৩) যদি খলিফা কোন ব্যক্তি অথবা জনগনকে আহ্বান জানায় তাহলে অবশ্যই বেরিয়ে পড়তে হবে।

৪) যদি কাফিররা মুসলিমদের মধ্যে থেকে কিছু মানুষকে বন্দি করে ফেলে।

প্রথম শর্তঃ যদি কাফিররা মুসলিমদের ভূমিতে প্রবেশ করেঃ

সালফে সালেহীনগণ, তাদের উত্তরসূরীগণ, চার মাযহাবের আলিমগণ (মালেকী, হানাফী, শাফেঈ, হাম্বলী) মুহাদ্দিসগণ এবং মুফাস্‌সিরগণ সকলেই, ইসলামের ইতিহাসের সকল সময়ে একমত পোষণ করেছেন যে, এই শর্তানুযায়ী জিহাদ ফরজে আইন হয়ে যায়। ফরজে আইন ঐ সকল মুসলিমদের উপর যাদের ভূমি কাফেররা আক্রমণ করেছে অথবা যারা আক্রান্ত মুসলিম ভূমির কাছাকাছি রয়েছে। এরূপ পরিস্থিতিতে জিহাদে ঝাঁপিয়ে পড়ার

---

[১৪] হাসিয়াত ইবনু আবিদীন, ৩/২৩৮।

জন্য সন্তানকে তার পিতা-মাতার কাছ থেকে, স্ত্রীকে তার স্বামীর কাছ থেকে, দাসকে তার মনিবের কাছ থেকে এবং দেনাদারকে তার পাওনাদারের কাছ থেকে অনুমতি নেওয়ার প্রয়োজন হয় না।

কিন্তু ঐ আক্রান্ত অঞ্চলের মুসলিমরা যখন সৈন্যের ঘাটতির কারণে অথবা অক্ষমতা কিংবা গাফিলতির কারণে কাফিরদেরকে তাদের ভূমি থেকে বিতারিত করতে না পারে তাহলে তখন এই ফরজে আইনের হুকুমটি ঐ আক্রান্ত ভূমির নিকটবর্তী মুসলিমদের উপর, তারপর তার নিকটবর্তী মুসলিমদের উপর প্রযোজ্য হবে। আর যদি তাদেরও গাফিলতি অথবা জনশক্তির ঘাটতি থাকে তাহলে পরবর্তীদের উপর, অতপর পরবর্তী এলাকার মুসলিমদের উপর এই হুকুম বর্তাতে থাকে; যতক্ষণ পর্যন্ত না এই ঘাটতি পূরণ হয় ততক্ষণ পর্যন্ত এটি চলতে থাকবে এবং এক পর্যায়ে এটি পুরো দুনিয়ার মুসলিমদের উপর ফরজ আইন হয়ে যাবে।

এই বিষয়ের উপর শাইখ ইবনে তাইমিয়্যাহ রহ. বলেন,
"প্রতিরক্ষামূলক জিহাদ, যার মাধ্যেমে আগ্রাসী শত্রুদের (মুসলিমদের ভূমি থেকে) বের করে দেয়া হয়, এটি জিহাদের মধ্যে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ একটি জিহাদ। সর্বজন স্বীকৃত যে, দ্বীন এবং নিজেদের সম্মান রক্ষা করা হচ্ছে একটি আবশ্যক দায়িত্ব। ঈমান আনার পর প্রথম বাধ্যতামূলক দায়িত্ব হল আগ্রাসী শত্রুদের পার্থিব ও দ্বীনের উপর আগ্রাসনকে প্রতিহত করা। এক্ষেত্রে কোন ওজর-আপত্তি করার কোন সুযোগ নেই; যেমনঃ সরবরাহ অথবা পরিবহন, বরং যার যতটুকু সামর্থ্য আছে তা নিয়েই জিহাদ চালিয়ে যেতে হবে। আলিমগণ, আমাদের সহকর্মীগণ এবং অন্যান্যরাও এ বিষয়ের উপর একমত।"

ইমাম ইবনে তাইমিয়া রহ. কাজীর বক্তব্যের প্রতি দ্বিমত পোষণ করেছিলেন, যিনি যানবাহনকে শর্ত হিসেবে উল্লেখ করে বলেছিলেন, "জিহাদ যদি কোন দেশে ফরজুল আইন হয় তখন হজ্জের ক্ষেত্রে যেমন যানবাহন থাকা জরুরী ঠিক জিহাদের ক্ষেত্রেও যানবাহন থাকা জরুরী (যদি শত্রুদের দুরত্ব সফরের দুরত্বের সমান হয়)।
ইবনে তাইমিয়্যাহ রহ. আরও বলেন, "কাজী হজ্জের সাথে তুলনার ক্ষেত্রে যে কথা বলেছেন তা এর পূর্বে অন্য কেউ বলেনি এবং এটি হচ্ছে একটি দুর্বল

উক্তি। জিহাদ হচ্ছে ফরজ কারণ এর মাধ্যমে শত্রুদের দ্বারা ক্ষতিকে দূর করতে হয় এবং এই কারণেই এটি হজ্জের উপর অগ্রাধিকার পায়।

হজ্জের জন্য কোন যানবাহন অত্যাবশকীয় নয়। জিহাদের ক্ষেত্রে অনেকে অগ্রাধিকার দিয়েছে। অন্য একটি সহীহ্ হাদীসে বর্ণিত হয়েছে,

عبادة بن الصامت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: على المرء المسلم السمع والطاعة في عسره ويسره ومنشطه ومكرهه وأثرة عليه.

অর্থ: "উবাদা বিন সামিত রা. হতে বর্ণিত নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন, মুসলিমদের উপর এটি আবশ্যক যে, তাকে শুনতে ও মানতে হবে কঠিন এবং সহজ সময়ে, তার পছন্দ হোক বা অপছন্দ এবং যদিও তার অধিকার তাকে না দেয়া হয়।"[১৫]

তাই এই আবশ্যক দায়িত্বের একটি খুঁটি হচ্ছে জিহাদে বেরিয়ে পড়তে হবে, যদিও আমাদের কঠিন অথবা সহজ সময় হয়। যেভাবে হজ্জের ক্ষেত্রে বলা হয়েছে যে, ফরজ কাজগুলো কঠিনতর সময়গুলোতেও বহাল থাকে এবং এটা হল আক্রমনাত্মক জিহাদের ক্ষেত্রে। কিন্তু প্রতিরোধমূলক জিহাদের ক্ষেত্রে এই ফরজ কাজটির প্রয়োজনীয়তা আরও অনেক গুনে বেড়ে যায়। দ্বীন এবং পবিত্র বিষয়গুলো আগ্রাসী শত্রুদের হতে রক্ষা করা হল ফরজ- এক্ষেত্রে সবাই একমত। ঈমান আনার পর প্রথম বাধ্যতামূলক দায়িত্ব হল আগ্রাসী শত্রুদেরকে পার্থিব ও দ্বীনের উপরে আগ্রসনকে প্রতিরোধ করা।

আমরা এখন এ ব্যাপারে ৪ মাযহাবের মতামত দেখবো যারা সবাই এ বিষয়ে একমত ছিলেন। মাযহাবগুলোর মতামত সমূহ:

হানাফি মাযহাব:

ইবনে আবিদীন মুহাম্মাদ আমীন আল হানাফী রহ. বলেছেন, "যদি শত্রুরা মুসলিমদের সীমানায় আক্রমণ চালায় এমতাবস্থায় জিহাদ করা ফরজে আইন হয়ে যায় এবং এই ফরজে আইন হয় তাদের উপর যারা ঐ আক্রান্ত এলাকার নিকটে অবস্থান করছে। যদি নিকটবর্তীদের সাহায্যের প্রয়োজন না হয়, তাহলে আক্রান্ত এলাকা হতে যারা দূরে অবস্থান করছে তাদের জন্য এটি ফরজে কিফায়া।

[১৫] কিতাবুল ইখতিয়ারাত আল ইলমিয়্যাহ, ইবনে তাইমিয়া। ফাতাওয়া কুবরা, ৪/৬০৮।

আর যদি তাদের সাহায্যের প্রয়োজন পড়ে তাহলে তাদের পরবর্তী নিকটবর্তী যারা আছে তাদের উপর এটি ফরজে আইন হয়ে যায়। সেক্ষেত্রে হতে পারে যে, সীমান্তবর্তী এলাকার মুসলিমদের প্রচেষ্টায় শত্রুরা প্রতিহত হচ্ছে না অথবা তারা অলসতায় বসে আছে অথবা জিহাদ করছে না। এমতাবস্থায় এটি তাদের পরবর্তী নিকটবর্তী মুসলিমদের উপর ফরজ আইন হয়ে যাবে; ঠিক যে রকমভাবে তাদের উপর সালাত ও সিয়াম ফরজ। এই হুকুমকে পরিত্যাগ করার তাদের কোনই সুযোগ নেই। যদি তারাও অক্ষম হয়ে পড়ে তাহলে এটি ফরজে আইন হবে পরবর্তী নিকটবর্তীদের উপর এবং এই পদ্ধতি অব্যাহত থাকবে যতক্ষণ পর্যন্ত না পূর্ব হতে পশ্চিম পর্যন্ত পুরো মুসলিম উম্মাহর উপর ফরজে আইন হয়ে যায়।"

আর কাসানি[১৬], ইবনে নাজিম[১৭], ইবনে হাম্মাম[১৮], এর পক্ষ থেকেও ঠিক একই ফাতওয়া দেয়া হয়েছে।

মালেকী[১৯] ফিক্হ:

হাশিয়াতুদ দুসুকী[২০]তে বলা হয়েছে যে, জিহাদ ফরজ আইন হয় তখন, যখন শত্রুপক্ষ হতে আকস্মিক আক্রমণ করা হয়। দুসুকী বলেন, যখন এমনটি ঘটে তখন প্রত্যেকের উপর জিহাদ ফরজ আইন হয়ে যায়। এমনকি মহিলা শিশু, দাস-দাসীদের উপরও। যদিও তারা তাদের অভিভাবক, স্বামী অথবা ঋণদাতার পক্ষ থেকে বাঁধাপ্রাপ্ত হয়।[২১]

শাফেঈ[২২] মাযহাব:

রামলী[২৩] লিখিত 'নিহায়াতুল মুহতাজ' নামক গ্রন্থে বলা হয়েছে যে, যদি তারা (কাফিররা) আমাদের ভূমিতে আক্রমণ চালায় এবং তাদের ও আমাদের মধ্যকার দুরত্ব হয় -যতটুকু দুরত্বের সফর সালাতের বিধান রয়েছে তার

---

[১৬] আল-কাসানি, আবূ বকর বিন মাসুদ। বিদায়া আস সানায়া ৭/৭২।
[১৭] ইবনে নাজিম, ইবরাহীম আল মিসরী আল হানাফী। আল বাহরুর রায়িক, ৫/১৯১।
[১৮] ইবনুল হাম্মাম, আল-কামাল। ফাতহুল কাদীর ৫/১৯১।
[১৯] ইমাম মালিক বিন আনাস বিন মালিক।
[২০] আদ দুসুকী, ইবরাহীম।
[২১] হাশিয়াতুদ দুসুকী ২/১৭৪।
[২২] ইমাম আশাফিঈ, মুহাম্মাদ বিন ইদ্রীস বিন আব্বাস।
[২৩] আর-রামলী, আহমদ।

অপেক্ষা কম, তাহলে ঐ ভূমির মুসলিমদের উপর তাদের ভূমিকে রক্ষা করা ফরজে আইন হয়ে যায়। এমনকি এটি তাদের উপরেও ফরজে আইন হয়ে যায়, যাদের উপর কোন জিহাদ নেই, যেমনঃ মহিলা, শিশু, দাস-দাসী, ঋণগ্রস্থ ব্যক্তি।[২৪]

হাম্বলী[২৫] মাযহাবঃ

ইমাম আল কুদামাহ[২৬] লিখিত কিতাব আল-মুঘনিতে তিনি বলেছেন, জিহাদ তিনটি অবস্থায় ফরজে আইন হয়ে যায়ঃ

১। যদি উভয়পক্ষ যুদ্ধে মিলিত হয় এবং একে অপরের মুখোমুখি হয়।

২। যদি কাফিররা কোন মুসলিমদের ভূমিতে প্রবেশ করে, তখন সেখানকার মুসলিমদের উপর জিহাদ ফরজে আইন হয়।

৩। যদি ইমাম অথবা খলিফা মুসলিমদেরকে অগ্রসর হওয়ার জন্য আদেশ দেন, তখন তাদের উপর এটি ফরজে আইন হয়ে যায়।"[২৭]

এব্যাপারে ইবনে তাইমিয়্যাহ রহ. বলেন,

إذا دخل العدو بلاد الإسلام فلا ريب أنه يجب دفعه على الأقرب فالأقرب، إذ بلاد الإسلام كلها بمنزلة البلدة الواحدة، وأنه يجب النفير اليه بلا إذن والد ولا غريم، ونصوص أحمد صريحة بهذا.

অর্থঃ "এতে কোন সন্দেহ নেই যে যদি কোন শত্রু মুসলিম ভূমিতে প্রবেশ করে তবে ঐ ভূমির নিকটবর্তীদের, অতঃপর তার নিকটবর্তীদের উপর তাদেরকে (শত্রুদেরকে) বহিস্কার করা ফরজে আইন হয়ে যায় কারণ, মুসলিমদের ভূমিসমূহ হল একটি ভূমির মত। তাই এক্ষেত্রে জিহাদে বের হওয়ার জণ্য পিতা-মাতা অথবা ঋণদাতার কাছ থেকে অনুমতি ব্যতীতই অগ্রসর হওয়া হল ফরজ এবং বর্ণনাগুলো আহমদ হতে এসেছে এবং তিনি এ বিষয়ের সাথে একমত পোষণ করেছেন।"[২৮]

এই পরিস্থিতিটি সাধারণ অভিযান নামে পরিচিত।

---

[২৪] নিহায়াতুল মুহতাজ।

[২৫] ইমাম আহমাদ বিন মুহাম্মাদ বিন হাম্বলী, আশ শাইবানী।

[২৬] ইবনু কুদামা আল মাকদীসি, মুয়াফিক উদ্দীন আবূ মুহাম্মাদ আব্দুল্লাহ বিন আহমদ আল হাম্বলী।

[২৭] আল মুঘনী ৮/৩৫৪।

[২৮] ফাতাওয়া আল কুবরা, ৪/৬০৮।

সাধারণ অভিযানের দলীলসমূহ এবং এর সমর্থন:

১) মহান আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলা বলেন,

انْفِرُوا خِفَافًا وَثِقَالًا وَجَاهِدُوا بِأَمْوَالِكُمْ وَأَنْفُسِكُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ ذَلِكُمْ خَيْرٌ لَكُمْ إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ.

অর্থ: "তোমরা হালকা হোক অথবা ভারী উভয় অবস্থায় যুদ্ধে বের হও এবং তোমাদের মাল ও জান নিয়ে আল্লাহর রাস্তায় জিহাদ কর। এটা তোমাদের জন্য উত্তম, যদি তোমরা জানতে।"[২৯]

যারা সম্মুখ অভিযানে বের হবে না, আল্লাহ তা'আলা তাদের জন্য চরম শাস্তির ব্যবস্থা করেছেন এবং তাদেরকে অন্য জাতি দ্বারা স্থলাভিষিক্ত করে দিবেন যারা ইসলামের সত্যিকার বাহক হবে- এটি হল তাদের প্রতিদান স্বরূপ এবং এ রকম আরেকটি আয়াত পূর্বে উল্লেখ করা হয়েছে। আল্লাহ শুধুমাত্র তাদেরকেই শাস্তি দিবেন যারা তাদের ফরজসমূহকে পরিত্যাগ করেছে এবং হারাম কাজে লিপ্ত থেকেছে। মহিমান্বিত আল্লাহ বলেন,

إِلا تَنْفِرُوا يُعَذِّبْكُمْ عَذَابًا أَلِيمًا وَيَسْتَبْدِلْ قَوْمًا غَيْرَكُمْ وَلا تَضُرُّوهُ شَيْئًا وَاللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ.

অর্থ: "যদি তোমরা (যুদ্ধে) বের না হও, তিনি তোমাদের বেদনাদায়ক আযাব দেবেন এবং তোমাদের পরিবর্তে অন্য এক কওমকে আনয়ন করবেন, আর তোমরা তাঁর কিছুমাত্র ক্ষতি করতে পারবে না। আর আল্লাহ সবকিছুর উপর ক্ষমতাবান।"[৩০]

ইবনে কাছির[৩১] রহ. বলেন, "আল্লাহ তা'আলা আদেশ দিয়েছিলেন যে, প্রত্যেকেই যেন আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের সাথে তাবুক যুদ্ধে শত্রুদের (যারা রোমানের আহলে কিতাব ছিল) সাথে যুদ্ধ করার জন্য অভিযানে বের হয়ে পড়ে। ঈমাম বুখারী তার সহীহ বুখারী শরীফের সম্মুখ অভিযানের শর্ত ও জিহাদের জন্য প্রয়োজনীয় বিষয় এবং এর জন্য নিয়্যত

---

[২৯] সূরা তাওবা, আয়াত ৪১।

[৩০] সূরা তাওবা, আয়াত ৪১।

[৩১] ইবনু কাসীর, আবুল ফিদা ইসমাঈল বিন আবি হাফস শিহাব উদ্দীন উমার বিন কাসীর বিন দাউবিন কাসীর বিন যার আল কুরাইশী।

নামক অধ্যায়ে এই আয়াতটিতে (সূরা তাওবাহঃ ৩৯) উল্লেখ করেছেন। তাবুকের যুদ্ধের এই আদেশ ছিল সর্ব সাধারণের জন্য কেননা মুসলিমরা জানতে পেরেছিল যে, রোমানরা আরব উপদ্বীপের সীমানাগুলোতে জমা হচ্ছে এবং তারা মদীনা আক্রমণের প্রস্তুতি নিচ্ছে। তাহলে তখন কী করা উচিত যখন কাফিররা মুসলিমদের ভূমির ভিতরে প্রবেশ করছে; ঐ মুহূর্তে সম্মূখে অভিযান চালানো কি আরো বেশি অগ্রাধিকার পায় না?

আবু তালহা রা. সূরা তাওবার ৩৯ নং এই আয়াতটি সর্ম্পকে বলেন,

كهولا وشبابا ما سمع الله عذر أحد.

অর্থ: "আল্লাহ তা'আলা হালকা অথবা ভারী দ্বারা বুঝিয়েছেন যে তিনি বৃদ্ধ অথবা যুবক কারও অজুহাত শুনবেন না।"[৩২]

হাসান আল বসরী বলেন, কঠিন অথবা সহজ অবস্থায়।

ইবনে তাইমিয়্যাহ রহ. বলেন, "যদি শত্রুরা মুসলিমদের উপর আক্রমণ করার জন্য প্রস্তুতি নেয়, তখন আক্রান্ত মুসলিমদের উপর ঐ সকল শত্রুদেরকে বহিস্কার করা ফরজ হয়ে যাবে। ঠিক একইভাবে, যে সকল মুসলিমরা আক্রান্ত হয়নি তাদের উপরও এটি ফরজ। কেননা মহান আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলা বলেন,

إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَهَاجَرُوا وَجَاهَدُوا بِأَمْوَالِهِمْ وَأَنْفُسِهِمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَالَّذِينَ آوَوْا وَنَصَرُوا أُولَئِكَ بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاءُ بَعْضٍ وَالَّذِينَ آمَنُوا وَلَمْ يُهَاجِرُوا مَا لَكُمْ مِنْ وَلَايَتِهِمْ مِنْ شَيْءٍ حَتَّى يُهَاجِرُوا وَإِنِ اسْتَنْصَرُوكُمْ فِي الدِّينِ فَعَلَيْكُمُ النَّصْرُ إِلا عَلَى قَوْمٍ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُمْ مِيثَاقٌ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ.

অর্থ: "নিশ্চয়ই যারা ঈমান এনেছে, হিজরত করেছে এবং নিজদের মাল ও জান দিয়ে আল্লাহর রাস্তায় জিহাদ করেছে আর যারা আশ্রয় দিয়েছে ও সহায়তা করেছে, তারা একে অপরের বন্ধু। আর যারা ঈমান এনেছে, কিন্তু হিজরত করেনি, তাদেরকে সাহায্যের কোন দায়িত্ব তোমাদের নেই, যতক্ষণ না তারা হিজরত করে। **আর যদি তারা দীনের ব্যাপারে তোমাদের নিকট কোন সহযোগিতা চায়, তাহলে সাহায্য করা তোমাদের কর্তব্য।** তবে এমন কওমের

---

[৩২] মুখতাসার ইবনে কাসীর ২/১৪৪।

বিরুদ্ধে নয়, যাদের সাথে তোমাদের একে অপরের চুক্তি রয়েছে এবং তোমরা যে আমল কর, তার ব্যাপারে আল্লাহ পূর্ণ দৃষ্টিমান।"[৩৩]

এজন্যই রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম মুসলিমদের সহযোগিতা করার আদেশ দিয়েছেন -যখন তাদের সাহায্যের প্রয়োজন হয়। এতে কেউ বেতনভুক্ত যোদ্ধা হোক বা না হোক এবং এটাও দেখার বিষয় নয় যে তার ক্ষমতা কতটুকু আছে, বরং এটি সবার উপর ফরজ যে, প্রত্যেকে তার জান-মাল দিয়ে, সংখ্যায় অল্প হোক বা বেশি, যানবাহনে চড়ে হোক বা পায়ে হেঁটে তাদের সাহায্য করবে। আর এ কারণেই আহযাব এর যুদ্ধে যখন শত্রুরা মদীনায় আক্রমণ করেছিল, তখন আল্লাহ কাউকে এ দায়িত্ব হতে অব্যাহতি দেননি।[৩৪]

ইমাম যুহরী রহ. বলেন,

خرج سعيد بن المسيب إلى الغزو وقد ذهبت إحدى عينيه فقيل له: إنك عليل فقال: استنفر الله الخفيف والثقيل فإن لم يمكني الحرب كثرت السواد وحفظت المتاع.

অর্থ: "সাইয়্যিদ ইবনে মুসাইয়্যিব একচোখ অন্ধ অবস্থায় জিহাদের অংশগ্রহণ করেছিলেন। তখন লোকেরা তাকে বলল, আপনি তো ওযরপ্রাপ্তদের অন্তরভুক্ত। তিনি উত্তর দিলেন, আল্লাহ বৃদ্ধ ও যুবক উভয়কেই জিহাদে বের হওয়ার আদেশ করেছেন। আমার পক্ষে যদি যুদ্ধ করা সম্ভব না হয় অন্তত মুজাহিদদের সংখ্যা তো বৃদ্ধি করতে পারবো অথবা তাদের মালের দেখাশোনা করতে পারবো।"[৩৫]

২) মহান আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলা বলেন,

إِنَّ عِدَّةَ الشُّهُورِ عِنْدَ اللَّهِ اثْنَا عَشَرَ شَهْرًا فِي كِتَابِ اللَّهِ يَوْمَ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ مِنْهَا أَرْبَعَةٌ حُرُمٌ ذَلِكَ الدِّينُ الْقَيِّمُ فَلَا تَظْلِمُوا فِيهِنَّ أَنْفُسَكُمْ وَقَاتِلُوا الْمُشْرِكِينَ كَافَّةً كَمَا يُقَاتِلُونَكُمْ كَافَّةً وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ مَعَ الْمُتَّقِينَ.

অর্থ: "নিশ্চয়ই মাসসমূহের গণনা আল্লাহর কাছে বার মাস আল্লাহর কিতাবে, (সেদিন থেকে) যেদিন তিনি আসমান ও যমীন সৃষ্টি করেছেন। এর মধ্য থেকে

---

[৩৩] সূরা আনফাল, আয়াত ৭২।

[৩৪] মাজমুয়া আল ফাতাওয়া ২৮/৩৫৮।

[৩৫] আল জামে' লিল আহকামিল কুরআন ৮/১৫০।

চারটি সম্মানিত, এটাই প্রতিষ্ঠিত দীন। সুতরাং তোমরা এ মাসসমূহে নিজদের উপর কোন যুল্‌ম করো না, **আর তোমরা সকলে মুশরিকদের সাথে লড়াই কর যেমনিভাবে তারা সকলে তোমাদের সাথে লড়াই করে, আর জেনে রাখ, নিশ্চয় আল্লাহ মুত্তাকীদের সাথে আছেন।**"[৩৬]

ইবনুল আরাবি বলেন, "এখানে সর্বাত্মকভাবে বলতে বুঝানো হয়েছে যে, তাদেরকে প্রত্যেক দিক হতে অবরুদ্ধ করতে হবে এবং সকল সম্ভাব্য অবস্থানে।

৩) মহান আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলা বলেন,

وَقَاتِلُوهُمْ حَتَّى لا تَكُونَ فِتْنَةٌ وَيَكُونَ الدِّينُ كُلُّهُ لِلَّهِ فَإِنِ انْتَهَوْا فَإِنَّ اللَّهَ بِمَا يَعْمَلُونَ بَصِيرٌ.

অর্থ: **"আর তোমরা তাদের বিরুদ্ধে লড়াই কর যতক্ষণ না ফিতনার অবসান হয় এবং দীন পূর্ণরূপে আল্লাহর জন্য হয়ে যায়।** তবে যদি তারা বিরত হয় তাহলে নিশ্চয় আল্লাহ তারা যা করে তার সম্যকদ্রষ্টা।"[৩৭]

এখানে ফিতনা বলতে বুঝানো হয়েছে। যেভাবে ইবনে আববাস রা. এবং সুদ্দী রহ. বলেছেন, যখন কাফিররা (মুসলিমদের) কোন ভূমিতে আক্রমণ করে এবং তা দখল করে নেয়, তখন পুরো উম্মাহ তাদের দ্বীনের ক্ষেত্রে বিপদে পতিত হয় এবং তাদের ঈমানের মধ্যে সন্দেহ অনুপ্রবেশ করবে। তাই ঐ মুহূর্তে তাদের জান, মাল, ইজ্জত এবং দ্বীনকে রক্ষা করার জন্য জিহাদ করা বাধ্যতামূলক দায়িত্ব হয়ে পড়ে।[৩৮]

৪) নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন,

لا هجرة بعد الفتح، ولكن جهاد ونية، فإذا استنفرتم فانفروا.

অর্থ: "ফাতহে মক্কার পর আর কোন হিজরত নেই, কিন্তু অবশিষ্ট থাকবে শুধু জিহাদ এবং নিয়্যত। তাই যদি তোমাদেরকে অভিযানে অগ্রসর হতে বলা হয় তখন তোমরা অগ্রসর হবে।"[৩৯]

---

[৩৬] সূরা তাওবা, আয়াত ৩৬।
[৩৭] সূরা আনফাল, আয়াত ৩৯
[৩৮] আল কুরতুবী ২/২৫৩।
[৩৯] সহীহ বুখারী।

যখন শত্রুরা মুসলিমদের উপর আক্রমণ করেছে, এইরূপ পরিস্থিতিতে যদি উম্মাহকে সাধারণ অভিযানের জন্য আহ্বান করা হয়, তখন উম্মাহর উপর এটি বাধ্যতামূলক হয় যায় যে, তারা এ অভিযান অংশগ্রহণ করবে। উম্মাহকে তাদের দ্বীনের সুরক্ষার জন্যই অগ্রসর হতে হবে। এই বাধ্যতামূলক দায়িত্বের সীমা রেখা মুসলিমদের প্রয়োজন এবং ইমামের দাবী অনুযায়ী নির্ভর করে।" এভাবেই ইবনে হাজার এই হাদীসটির ব্যাখ্যা দিয়েছেন।

কুরতুবী রহ. বলেছেন,

كل من علم بضعف المسلمين عن عدوهم وعلم أنه يدركهم ويمكنه غياثهم لزمه أيضا الخروج اليهم.

অর্থ: "যে কেউ যদি শত্রুর সামনে মুসলিমদের দূর্বলতার ব্যাপারে জ্ঞাত হন এবং জানেন যে, তিনি আক্রান্তদের নিকট পৌঁছাতে পারবেন এবং তাদেরকে সাহায্য করতে পারবেন তাহলে তাদের উপরও সম্মুখে অগ্রসর হওয়া বর্তায়।[৪০]

৫) প্রত্যেকটি দ্বীন যা আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলার পক্ষ থেকে নাযিল করা হয়েছে, তা **৫টি** প্রয়োজনীয় বিষয়কে হিফাজতের নিশ্চয়তা দেয়, দ্বীন, জান, মাল, ইজ্জত এবং নফস। অতএব, যেকোনভাবেই হোক এই **৫টি** প্রয়োজনীয় বিষয়কে অবশ্যই হিফাজত করতে হবে। আর আগ্রাসী শত্রুদের বিতারিত করার জন্য ইসলাম আদেশ করেছে। আগ্রাসী হল সেই ব্যক্তি যে, অন্যের উপর জোর পূর্বক নিজের ক্ষমতাকে চাপিয়ে দেয়, তাদেরকে হত্যা করার জন্য, তাদের সম্পদ এবং ভূমিকে কুক্ষিগত করার জন্য।

ক) ইজ্জতের উপর আগ্রাসী শক্তির আক্রমণ: এমনকি যদি কোন মুসলিমও কারো ইজ্জতের উপর আগ্রাসন চালায়, তাহলে তা প্রতিরোধ করা তার উপর বাধ্যতামূলক যদিও এর জন্য তাকে হত্যা করা হয়, এ বিষয়ের উপর সকল আলিমগণ একমত পোষণ করেছেন। অনুরূপভাবে, এবিষয়েও আলিমগণ একমত পোষণ করেছেন যে, কোন মুসলিম মহিলার জন্য অনুমতি নেই যে, সে নিজেকে কুফ্ফারদের নিকট আত্মসমপর্ণ করে দিবে অথবা তাকে বন্দি করার সুযোগ করে দিবে, যদিও তাকে হত্যা করা হয় অথবা তার ইজ্জত হরনের আশংকা থাকে।

খ) জান ও মালের উপর আগ্রাসী শক্তির আক্রমণ: অধিকাংশ আলিমগণ এ ব্যাপারে ঐক্যমত্ব পোষণ করে রায় দিয়েছেন যে, যদি আগ্রাসী শক্তি আক্রমণ

---

[৪০] ফাতহুল বারী ৬/৩০।

করে জান অথবা মালের উপর তাহলে তাদেরকে সর্বশক্তি দিয়ে বিতারিত করা হচ্ছে বাধ্যতামূলক।

এ বিষয়ে মালেকী ও শাফেঈ মাযহাবের মত হচ্ছে, আগ্রাসী শক্তি যদি মুসলিমও হয় তবুও তাকে হত্যা করা বৈধ। সহীহ হাদীসে বর্ণিত রয়েছে,

من قتل دون ماله فهو شهيد، ومن قتل دون دمه فهو شهيد ومن قتل دون دينه فهو شهيد ومن قتل دون أهله فهو شهيد.

অর্থ: "যে তার মাল রক্ষার জন্য হত্যা করা হয় সে শহীদ, যে তার জান রক্ষার জন্য হত্যা করা হয় সে শহীদ, যে তার পরিবার রক্ষার জন্য হত্যা করা হয় সে শহীদ।"[৪১]

আল-জাস্‌সাস রহ. এই হাদীস সর্ম্পকে অবগত হওয়ার পর বলেছেন, "আমরা এই বিষয়ে কোন প্রকার দ্বিমত পাই নি যে, যদি কোন ব্যক্তি অন্য কারো উপর অন্যায়ভাবে হত্যা করার জন্য অস্ত্র ধারণ করে, তাহলে মুসলিমদের বাধ্যতামূলক দায়িত্ব হল তারা ঐ আগ্রাসী ব্যক্তিকে হত্যা করবে।"[৪২]

এমতাবস্থায় ঐ আগ্রাসী ব্যক্তি যদি মারা যায়, তাহলে জাহান্নামে যাবে, যদিও সে মুসলিম হয়। একই আক্রান্ত ব্যক্তি যদি মারা যায়, তাহলে সে শহীদ। এটা হল ইসলামের রায় একজন মুসলিম আগ্রাসীর ক্ষেত্রে, তাহলে এটা কিভাবে মেনে নেয়া যায় যে, কাফিররা মুসলিমদের ভূমির উপর আক্রমণ করবে, নির্যাতন ও অপমান করবে দ্বীনকে, ভূমিকে এবং ক্ষতি করতে থাকবে জান ও মালের যতক্ষণ না নিশ্চিহ্ন হয়ে পড়ে? এ পরিস্থিতিতে মুসলিমদের উপর এটি কি সর্বাগ্রে বাধ্যতামূলক দায়িত্ব হয়ে পড়ে না যে, মুসলিমরা কাফেরদেরকে বহিস্কার করবে, তাতে যদি সে একা হয় অথবা পুরো মুসলিম জাতি একত্রিত হতে হয় তবুও।

৬) যদি কাফিররা কোন মুসলিম বন্দিদেরকে তাদের কোন মুসলিম ভূমি দখলের অভিযানের ঢাল হিসাবে ব্যবহার করে, তখন ঐ কাফেরদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করা বাধ্যতামূলক, যদিও এতে ঐ মুসলিম বন্দীদের নিহত হতে হয়।

ইবনে তাইমিয়্যাহ রহ. বলেছেন, "যদি কাফিরদের সাথে মুসলিমদের সৎকর্মশীল কোন ব্যক্তি থাকে, যিনি মানুষের মধ্যে সর্বোত্তম ব্যক্তি; কিন্তু তাকে (সৎকর্মশীল মুসলিমকে) হত্যা করা ব্যতীত যদি কাফিরদের সাথে যুদ্ধ করা সম্ভব না হয়

[৪১] মুসনাদে আহমাদ, আবূ দাউদ, তিরমিযী, নাসাঈ। সহীহ আল জামিউস সাগীর, আলবানী ৬৩২১।

[৪২] আহকামুল কুরআন, জাসসাস ১/২৪০২।

তাহলে ঐ পরিস্থিতিতে তাকে হত্যা করা বৈধ। নেতৃস্থানীয় আলিমগণ এ বিষয়ে একমত পোষণ করেছেন যে, যদি কাফিররা মুসলিম বন্দীদের মানবঢাল হিসাবে ব্যবহার করে এবং এ কারণে আশংকা হয় বাকি মুসলিমরা তাদের (কাফিরদের) সাথে যুদ্ধ করতে পারবে না, তাহলে এটি অনুমোদিত যে কাফিরদের লক্ষ্য করে তীর ছোড়া হবে যদিও এতে মুসলিমরা নিহত হয়।

আলিমগণের মধ্যে একজন বলেছেন, যদি সমস্ত মুসলিমের ক্ষতির আশংকা নাও থাকে সেক্ষেত্রেও ঐ পরিস্থিতিতে মুসলিম বন্দীদের লক্ষ্য করে তীর ছোড়া বৈধ। তিনি আরও বলেছেন, সুন্নাহ এবং ইজমা (আলিমগণের ঐক্যমত) হচ্ছে যদি আগ্রাসী মুসলিম হয় এবং তাকে হত্যা না করে কোনো মতেই তার আগ্রাসনকে ঠেকানো সম্ভব না হয়, তাহলে তখন তাকে অবশ্যই হত্যা করতে হবে। যদিও তার আগ্রাসন এক দিনারের ভগ্নাংশের পরিমাণ হয়। এটি এ জন্য যে, সহীহ হাদীসে এসেছে, রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন, "যে ব্যক্তি তার মাল রক্ষা করতে গিয়ে নিহত হয় সে শহীদ।"[৪৩]

এটি এ কারণে যে, অবশিষ্ট সমস্ত মুসলিমদেরকে শির্ক এবং ফিতনা থেকে বাঁচানো, তাদের দ্বীন, ইজ্জত এবং সম্পদকে রক্ষা করা অল্প সংখ্যক মুসলিম বন্দীদেরকে কাফিরদের নিকট থেকে রক্ষা করার চেয়ে অগ্রাধিকার পায়।

৭) বিদ্রোহী মুসলিম গ্রুপের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করা:

মহান আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলা বলেন,

وَاِنْ طَائِفَتَانِ مِنَ الْمُؤْمِنِيْنَ اقْتَتَلُوْا فَاَصْلِحُوْا بَيْنَهُمَا. فَاِنْ بَغَتْ اِحْدٰىهُمَا عَلَى الْاُخْرٰى فَقَاتِلُوا الَّتِيْ تَبْغِيْ حَتّٰى تَفِيْۤءَ اِلٰۤى اَمْرِ اللّٰهِ فَاِنْ فَآءَتْ فَاَصْلِحُوْا بَيْنَهُمَا بِالْعَدْلِ وَاَقْسِطُوْا اِنَّ اللّٰهَ يُحِبُّ الْمُقْسِطِيْنَ.

অর্থ: "আর যদি মুমিনদের দুই দল পরস্পরে যুদ্ধে লিপ্ত হয়ে পড়ে, তাহলে তোমরা তাদের মধ্যে মীমাংসা করে দিবে। অত:পর যদি কোন দল অন্যায়ভাবে অপর পক্ষের উপর আক্রমণ করে, তবে তোমরা আক্রমণকারী দলের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করতে থাকো, যে পর্যন্ত না তারা সত্যের পথে ফিরে আসে। যদি তারা ফিরে আসে তবে তোমরা তাদের মাঝে ন্যায় সঙ্গতভাবে ফায়সালা করে দিবে। আর সর্বদা ন্যায়বিচার করবে। নিশ্চয়ই আল্লাহ ন্যায়বিচারকারীদের ভালবাসেন।"[৪৪]

---

[৪৩] **মুসনাদে আহমাদ**, আবূ দাউদ, তিরমিযী। জামিউস সাগীর, আলবানী ৬৩২১।
[৪৪] **সূরা হুজুরাত** ৪৯, আয়াত ৯।

যদি মুসলিমদের দ্বীন, ইজ্জত, সম্পদ রক্ষার জন্য এবং মুসলিমদের মধ্যে একতা বজায় রাখার জন্য বিদ্রোহী মুসলিমদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করা আল্লাহর তা'আলার তরফ হতে আদেশ হয়, তাহলে আগ্রাসী কাফিরদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করা কি আরও বেশি অগ্রাধিকার পায় না?

৮) যদি মুসলিমদের মধ্য থেকে কোনো ব্যক্তি যুদ্ধ করে তার ক্ষেত্রে হুকুম: মহান আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলা বলেন,

إِنَّمَا جَزَاءُ الَّذِينَ يُحَارِبُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَسْعَوْنَ فِي الْأَرْضِ فَسَادًا أَنْ يُقَتَّلُوا أَوْ يُصَلَّبُوا أَوْ تُقَطَّعَ أَيْدِيهِمْ وَأَرْجُلُهُمْ مِنْ خِلَافٍ أَوْ يُنْفَوْا مِنَ الْأَرْضِ ذَلِكَ لَهُمْ خِزْيٌ فِي الدُّنْيَا وَلَهُمْ فِي الْآخِرَةِ عَذَابٌ عَظِيمٌ.

অর্থ: "যারা আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করে এবং যমীনে ফাসাদ (ডাকাতি)করে বেড়ায়, তাদের আযাব কেবল এই যে, তাদেরকে হত্যা করা হবে অথবা শূলে চড়ানো হবে কিংবা বিপরীত দিক থেকে তাদের হাত ও পা কেটে ফেলা হবে অথবা তাদেরকে দেশ থেকে বের করে দেয়া হবে। এটি তাদের জন্যে দুনিয়ায় লাঞ্ছনা এবং তাদের জন্য আখিরাতে রয়েছে মহা আযাব।"[৪৫]

এই হুকুমটি প্রযোজ্য হবে ঐ মুসলিম ব্যক্তির উপর যে মুসলিমদের মধ্যে যুদ্ধ চালায়। যে জমীনের উপর দুর্দশা এবং বিশৃঙ্খলা ছড়ায় এবং সম্পদ ও সম্মান নষ্ট করার চেষ্ট করে। রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম উক্ত শাস্তি বাস্তবায়ন করেছিলেন মুরতাদ হয়ে যাওয়া কিছু বেদুঈনের উপর। উক্ত ঘটনা বুখারী এবং মুসলিমে বর্ণিত হয়েছে। তাহলে ঐ সকল কাফির জাতির বিরুদ্ধে কি শাস্তি হওয়া উচিত যারা মুসলিমদের জনজীবনে বিপর্যয় নিয়ে আসছে এবং তাদের দ্বীন, ইজ্জত এবং সম্পদকে নষ্ট করছে? ওদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করাই কী মুসলিমদের প্রথম দায়িত্ব নয়?

এই হল কিছু কারণ এবং দলীল যা প্রমাণ করে যে, যখনই কাফির শত্রুরা মুসলিম ভূমিতে প্রবেশ করবে, তখন মুসলিমদের সাধারণ অভিযানে বের হওয়া উচিত।

---

[৪৫] সূরা আল মায়িদা: আয়াত ৩৩।

২য় অধ্যায় :

ফিলিস্তিন ও আফগানিস্তানে জিহাদের হুকুম

وَمَا لَكُمْ لا تُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَالْمُسْتَضْعَفِينَ مِنَ الرِّجَالِ وَالنِّسَاءِ وَالْوِلْدَانِ الَّذِينَ يَقُولُونَ رَبَّنَا أَخْرِجْنَا مِنْ هَذِهِ الْقَرْيَةِ الظَّالِمِ أَهْلُهَا وَاجْعَل لَنَا مِنْ لَدُنْكَ وَلِيًّا وَاجْعَل لَنَا مِنْ لَدُنْكَ نَصِيرًا.

অর্থ: "আর তোমাদের কি হল? যে, তোমরা আল্লাহর পথে লড়াই করছ না অসহায় সেই সকল নারী পুরুষ ও শিশুদের পক্ষে, যারা (জালিমের অত্যাচারে অতিষ্ঠ হয়ে) বলছে, হে আমাদের প্রতিপালক! আমাদেরকে এই জনপদ থেকে নিস্কৃতি দান কর, কেননা, এখানকার অধীবাসীরা অত্যাচারী এবং আমাদের জন্য তোমার পক্ষ হতে একজন ওলী (অভিভাবক) নির্ধারণ করে দাও এবং একজন সাহায্যকারী নির্ধারণ করে পাঠাও।"[৪৬]

পূর্ববর্তী অধ্যায়গুলোতে এই বিষয়ে আলোচনা করা হয়েছে যে, যদি কাফেররা মুসলিমদের এক বিঘত জায়গাও দখল করে তবে তখন ওই জায়গা এবং তার নিকটবর্তী জায়গার মানুষদের উপর জিহাদ ফরজে আইন(প্রত্যেকের জন্য ফরজ) হয়ে যায়। যদি তারা অস্ত্রের অভাবে অথবা অলসতার কারণে কাফিরদের বের করতে সক্ষম না হয়, তখন এই জিহাদের এই দায়িত্বটি তার পার্শ্ববর্তী মুসলিমদের উপর বর্তায়, এই প্রক্রিয়া চলতে থাকে এবং এক পর্যায়ে পূর্ব থেকে পশ্চিম পর্যন্ত সমস্ত মুসলিমদের উপর জিহাদ করা ফরজে আইন হয়ে যায়। এই পরিস্থিতির স্ত্রীর জন্য স্বামীর নিকট থেকে, সন্তানের জন্য পিতা-মাতার কাছ থেকে, ঋণগ্রহীতার জন্য ঋণদাতার কাছ থেকে অনুমতি নেওয়া বাধ্যতামূলক থাকে না।

যদি এক বিঘত পরিমাণ জায়গাও -যা এক সময় মুসলিমদের নিয়ন্ত্রণে ছিল, কাফিররা দখল করে নেয়, তাহলে সেই জায়গাটুকু যতদিন পর্যন্ত পূণঃদখল না করা হবে ততদিন পর্যন্ত সকল মুসলিমদের ঘাড়ের উপর এই গুনাহের বোঝা ঝুলতে থাকবে।

---

[৪৬] সূরা নিসা, আয়াতঃ ৭৫।

এই গুনাহ এর পরিমাণ একজনের ক্ষমতা অথবা সামর্থ্যের ভিত্তিতে হবে। মুসলিমদের আলিমগণ, নেতাগণ এবং দায়ীগণ যারা সমাজে সুপরিচিত, তাদের গুনাহ সাধারণ জনগনের চেয়ে অনেক বেশি হবে।

বর্তমান আফগান, ফিলিস্তিন, ফিলিপাইন, কাশ্মির, লেবানন, চাঁদ ভারত, ইরাক ইত্যাদি অঞ্চলগুলোতে জিহাদের উদ্দেশ্যে গমন না করা হবে ঐ সকল পূর্বপুরুষদের চেয়েও বড় গুনাহ, যারা তাদের জীবদ্দশায় এই অঞ্চলগুলোকে কাফিরদের দখল থেকে মুক্ত করেনি। বর্তমানে আমাদের মনোযোগ দিতে হবে আফগানিস্তান ও ফিলিস্তিনের প্রতি কারণ এখানে সমস্যা বিরাট আকার ধারণ করেছে। অধিকন্তু আমাদের শত্রুরা অনেক বেশি ধোঁকাবাজ এবং তারা এই এলাকায় ক্ষমতা বৃদ্ধি করতে সিদ্ধহস্ত। আমরা যদি এই সমস্যা সমাধান করতে পারতাম তাহলে আমাদের অনেক জটিলতা কমে যেত। এই অঞ্চল দু'টিকে রক্ষা করা মানে হচ্ছে পুরো উম্মতকে রক্ষা করা।

আফগানিস্তান থেকে শুরু:

আরবদের মধ্য থেকে যার পক্ষে ফিলিস্তিনে জিহাদ করা সম্ভব তার অবশ্যই সেখানে জিহাদ শুরু করা উচিত। যদি তা তার পক্ষে সম্ভব না হয় তাহলে অবশ্যই তার আফগানিস্তানে শুরু করা উচিত। আমাদের মত হচ্ছে, ফিলিস্তিনের পূর্বে আফগানিস্তানের জিহাদ শুরু করা। এটি অবশ্যই এই কারণে নয় যে, আফগানিস্তান ফিলিস্তিনের চেয়ে গুরুত্বপূর্ণ। বরং ফিলিস্তিনের সমস্যাটা বড় ধরণের সমস্যা। এটি ইসলামী বিশ্বের হৃৎপিন্ড এবং এটি হচ্ছে একটি বরকতময় ভূমি, কিন্তু কিছু কিছু নির্দিষ্ট কারণে আফগানিস্তানে থেকে জিহাদ শুরু করা উচিত:

১। আফগানিস্তানের জিহাদ ধীরে ধীরে উন্নতির দিকে ধাবমান হচ্ছে; যেমন হিন্দুকুশ পর্বতমালায় মুজাহিদীনদের সফলতাই হচ্ছে এই ব্যাপারে সাক্ষী যার উদাহরণ নিকট অতীতে ইসলামের ইতিহাসে আর দেখা যায় নি।

২। আফগানিস্তানের জিহাদে যে পতাকা উত্তোলন করা হয়েছে তা সুস্পষ্ট এবং তার ভিত্তি হচ্ছে ঃ লা ইলাহা ইল্লাল্লাহু মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ" এবং এই জিহাদের উদ্দেশ্য হচ্ছে আল্লাহর কালিমাকে সবচেয়ে উঁচু করা। আফগান ইসলামিক ইউনিয়ন এর সংবিধানের দ্বিতীয় অনুচ্ছেদে আছে "আমাদের

একতার লক্ষ্য হচ্ছে আফগানিস্তানে ইসলামী রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠা করা।" তৃতীয় অনুচ্ছেদে আছে, আমাদের লক্ষ্য নেওয়া হয়েছে আল্লাহর বানী... বিধান দেবার অধিকার কেবল আল্লাহরই। অর্থাৎ শাসন-কর্তৃত্ব চলবে শুধুমাত্র বিশ্ব জাহানের প্রতিপালকের।

৩। প্রথম থেকেই মুসলিমরা আফগানিস্তানের জিহাদকে নিয়ন্ত্রণ করে আসছে, যারা বর্তমানে আফগানিস্তানে জিহাদের নেতৃত্ব দিচ্ছে তারা বিভিন্ন ইসলামী আন্দোলনের সন্তান, আলিম এবং কুরআনের ক্বারী। অথচ ফিলিস্তিনের নেতৃত্বের মধ্যে বিভিন্ন ধরণের লোক বিদ্যামান, তাদের মধ্যে আছে একনিষ্ঠ মুসলিম, কম্যুনিষ্ট, জাতীয়তাবাদী, মর্ডান মুসলিম। তারা মিলিত হয়ে একটি ধর্মনিরপেক্ষ পতাকা উত্তোলন করে আসছে।

৪। আফগানিস্তানের পরিস্থিতি এখন পর্যন্ত মুজাহিদদের নিয়ন্ত্রণে আছে। তারা নিরবিচ্ছিন্নভাবে কাফেরদেশগুলো থেকে সাহায্যের প্রস্তাব প্রত্যাখ্যান করে আসছে, যেখানে ফিলিস্তিন সম্পূর্ণভাবে সোভিয়েত ইউনিয়নের উপর নির্ভরশীল, যারা ফিলিস্তিনের জরুরী প্রয়োজনের সময় সাহায্য বন্ধ রাখে। তারা আন্তর্জাতিক চক্রান্তের সময় নিজেদের চেহারা লুকিয়ে রাখে। সেখানের পরিস্থিতি শক্তিশালী দেশগুলোর খেলার বিষয়বস্তুতে পরিণত হয়েছে। এই দেশগুলো মুসলিমের ভূমি, জনগন, ইজ্জত-সম্মান নিয়ে জুয়া খেলছে এবং ক্ষতি করছে যাতে ফিলিস্তিনের সামরিক শক্তি শেষ হয়ে যায়।

৫। আফগানিস্তানের তিন হাজার কিলোমিটার উম্মুক্ত সীমানা বিদ্যমান এবং এখানের গোত্রগুলো রাজনৈতিক প্রভাবমুক্ত, এটা মুজাহিদীনদের জন্য রক্ষা করার বর্মের মত। অথচ ফিলিস্তিনের পরিস্থিতি সম্পূর্ণ বিপরীত। সীমানাগুলি বন্ধ, মুসলিমদের হাতগুলি বন্ধ এবং প্রশাসনের গোয়েন্দারা সর্বক্ষণ গোয়েন্দাগীরি করছে, যাতে কেউ সীমানা লংঘন করে ইহুদীদের হত্যা করতে না পারে।

ইমাম শাফিঈ রহ. বলেছেন, যদি এমন কোন পরিস্থিতির উদ্ভব হয় যেখানে বিভিন্ন ধরণের শত্রু বিদ্যমান, এক শত্রু আরেক শত্রুর তুলনায় অধিক শক্তিশালী তখন ইমামের উচিত সবচেয়ে শক্তিশালী শত্রুর সাথে যুদ্ধে লিপ্ত হওয়া। যদি ইমামের অবস্থান অনেক দূরে হয় তবুও এটি গ্রহণযোগ্য। এটি

এই কারণে যে এটা প্রমাণিত হবে যে, আল্লাহর ইচ্ছায় সে ভীত নয় এবং সে যেন অন্যের জন্য অনুসরণযোগ্য উদাহরণ হয়।

এই সিদ্ধান্ত প্রয়োজন অনুসারে নেয়া যেতে পারে, যা প্রয়োজনের সময় জায়েয তা হয়তো অন্য সময় জায়েয নয়, এই ধরনের পরিস্থিতি রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর সময় ঘটেছিল যখন তিনি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম শুনলেন হারিস ইবনে আবি যিরার তার (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) তার বিরুদ্ধে যুদ্ধ করার জন্য জড়ো হচ্ছে তখন তিনি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম হারিসের চেয়ে নিকবর্তী শত্রু থাকা সত্বেও হারিসকে আক্রমণ করলেন। অধিকিন্তু তিনি খবর পেলেন খালিদ বিন আবি সুগলান ইবনে শুহ তার সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের বিরুদ্ধে শক্তি জড়ো করছে, তখন তিনি ইবনে উনায়সকে পাঠালেন তিনি তাকে হত্যা করলেন। যদিও তখন তার চাইতে নিকটবর্তী শত্রু বিদ্যমান ছিল।

৬। আফগানিস্তানের মানুষ তাদের শক্তি এবং গর্বের ব্যাপারে বিখ্যাত, মনে হয় যেন আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলা এখানের পাহাড় এবং ভূমিকে জিহাদের জন্য তৈরি করে রেখেছেন।

ফরজুল আইন ও ফরজুল কিফায়া

لَوْ كَانَ عَرَضًا قَرِيبًا وَسَفَرًا قَاصِدًا لَاتَّبَعُوكَ وَلَكِنْ بَعُدَتْ عَلَيْهِمُ الشُّقَّةُ وَسَيَحْلِفُونَ بِاللَّهِ لَوِ اسْتَطَعْنَا لَخَرَجْنَا مَعَكُمْ يُهْلِكُونَ أَنْفُسَهُمْ وَاللَّهُ يَعْلَمُ إِنَّهُمْ لَكَاذِبُونَ.

অর্থ: "(হে নবী!) এতে যদি আশু লাভ থাকতো আর সফর হত সহজসাধ্য, তবে তারা অবশ্যই তোমার অনুসরণ করত, কিন্তু তাদের জন্য দূরত্ব দীর্ঘ হল। আর অচিরেই তারা আল্লাহর কসম করবে, 'যদি আমরা সক্ষম হতাম তাহলে অবশ্যই তোমাদের সাথে বের হতাম', তারা তাদের নিজদেরকেই ধ্বংস করে। আর আল্লাহ জানেন, নিশ্চয়ই তারা মিথ্যাবাদী।"[৪৭]

ফরজুল আইন:

এটি হচ্চে এমন ফরজ, যা প্রত্যেক মুসলিমের উপর পালন করা বাধ্যতামূলক। যেমন ঃ সালাত, সিয়াম।

ফরজুল কিফায়া:

এটি এমন একটি দায়িত্ব, যদি কিছু ব্যক্তি তা পালন করে তাহলে বাকী সবাই দায়িত্ব মুক্ত হয়ে যায়। ফরজুল কিফায়া মানে হচ্ছে, যদি প্রয়োজনীয় সংখ্যক ব্যক্তি এই দায়িত্ব পালন না করে তাহলে সবাই গুনাহগার হবে। যদি প্রয়োজনীয় সংখ্যক ব্যক্তি দায়িত্ব পালনে সাড়া দেয়, তাহলে বাকী সবাই দায়িত্বমুক্ত হয়ে যাবে।

প্রাথমিক অবস্থার ফরজুল কিফায়ার দিকে আহ্বান এবং ফরজুল আইনের দিকে আহ্বানের মধ্যে কোন পার্থক্য নেই। পার্থক্য এতটুকুই যে, ফরজুল কিফায়ার জন্য প্রয়োজনীয় সংখ্যক ব্যক্তি জোগাড় হলে সবাই দায়িত্ব মুক্ত হয়ে যায় অথচ ফরজুল আ'ইনের ক্ষেত্রে যত অধিক সংখ্যক ব্যক্তিই সাড়া দিক না কেন, বাকী সবাই দায়িত্ব মুক্ত হয় না।[৪৮]

এজন্যই ইমাম ফখরুদ্দিন রাজী ফরজুল কিফায়ার সংজ্ঞা দিতে গিয়ে বলেছেন, "এই দায়িত্ব পালন করার সময় দায়িত্ব পালনকারী ব্যক্তির দিকে তাকানো হয় না।"

ইমাম শাফেয়ী রহ. বলেছেন, "ফরজুল কিফায়ার এই হুকুমটি প্রত্যেক ব্যক্তির দিকে লক্ষ্য করেই করা হয় অথচ প্রয়োজন হচ্ছে কিছু সংখ্যক ব্যক্তি সাড়া দেওয়া। অধিকাংশ আলিমগণ এই সংজ্ঞার উপর একমত পোষণ করেছেন।

---

[৪৭] সূরা তাওবা, আয়াত ৪২।

[৪৮] আল মুগনী ৮/৩৭৫।

ইবনে হাজিব, আল-আমদি এবং ইবনে আব্দুস সাকুর। তারা বলেছেন ফরজুল কিফায়ার হুকুমটি প্রত্যেকের উপর করা হয়, কিন্তু প্রয়োজনীয় সংখ্যক দায়িত্বটি পালন করলে বাকী সবাই দায়িত্ব মুক্ত হয়ে যাবে। এই মত অনুসারে আফগানিস্তানে জিহাদ করা হচ্ছে ফরজুল কিফায়া।

উপরন্তু আফগানিস্তান থেকে রাশিয়ান ও কমিউনিষ্টদের বের করা পৃথিবীর প্রতিটি মুসলিমদের উপর বাধ্যতামূলক দায়িত্ব। যতক্ষণ পর্যন্ত না প্রয়োজনীয় সংখ্যক মুসলিম সাড়া দেয়। কমিউনিষ্টদেরকে সম্পূর্ণরূপে বহিস্কার করার পরই এই দায়িত্ব পালন না করার গুনাহ থেকে সবাই মুক্ত হবে। এটি এই কারণে যে, যখনই কাফিররা আক্রমণ করবে তখন ওদেরকে বহিস্কার করা বাধ্যতামূলক এবং এই কাফিরদের মুসলিম ভূমি থেকে বহিস্কার করা পর্যন্ত এই দায়িত্ব বহাল থাকবে।

কিছু লোক অনেক দূর থেকে মন্তব্য করে, "আফগানিস্তানের জিহাদে শুধু টাকার প্রয়োজন, মানুষের প্রয়োজন নেই।" -এই কথাটি সত্য নয়। যারা এমনটি বলেন তাদের কথার জবাবে এই পরিস্থিতি উল্লেখ করাই যথেষ্ট যে ছয় বছর ধরে আফগানিস্তানে রাশিয়ান আগ্রাসনের সময় দেশের বাইরে পঞ্চাশ লক্ষ শরণার্থী, দেশের ভিতরে সত্তর লক্ষ শরণার্থী এবং আরও কিছু ছিল পাহাড় জঙ্গলে।

সাইয়াফ বলেছেন, "চৌদ্দটি দেশ যার মধ্যে সর্বপ্রথম হচ্ছে সোভিয়েত ইউনিয়ন, তারা সকলে মিলে ওয়ারসো (WARSAW) চুক্তি এবং আর্ন্তজাতিক কমিউনিষ্টদের অনুসরণ করছে, তারা একত্রিত হয়ে আমাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করছে অথচ মুসলিম বিশ্ব এখনও তর্ক করছে যে, আফগানিস্তানে জিহাদ করা কি ফরজুল আইন নাকি ফরজুল কিফায়া?" সুতরাং প্রতিটি ব্যক্তি শহীদ হয়ে যাওয়া পর্যন্ত মুসলিমরা অপেক্ষা করুক তখন তাদের বিশ্বাস হবে যে, জিহাদ করা ফরজুল আইন। অথচ তারা জানে যে, এখন পর্যন্ত ১৫ লক্ষ শহীদ হয়ে গেছে। আফগানীরা বলে, "আমাদের মধ্যে একজন আরব থাকা এক মিলিয়ন ডলার থাকার চাইতে গুরুত্বপূর্ণ।" শাইখ সাইফ, জিহাদ ম্যাগাজিনে নবম পরিচ্ছদে আলিম এবং দা'য়ীদের উদ্দেশ্য করে বলেছেন:

বিসমিল্লাহির রাহমানির রাহিম।

সমস্ত প্রশংসা আল্লাহর জন্য, সালাত এবং সালাম রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম, তার পরিবার, সাহাবী এবং যারা হিদায়াতের উপর রয়েছে তাদের জন্য। আম্মাবাদঃ

আল্লাহর কিতার অনুযায়ী ইসলামী রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠা করার জন্য আপনারা জানতে পেরেছেন যে আফগানিস্তানে জিহাদ শুরু হয়েছে এবং চালু আছে। এই লক্ষ্য উপলব্ধি করার পর আমাদের এমন মুজাহিদীন দরকার যারা ইসলামকে সঠিকভাবে বুঝতে পেরেছে এবং সত্যিকারের ইসলামী জিহাদ পরিচালন করতে পারবে। উপরন্তু বিরামহীনভাবে শিক্ষা এবং উপদেশ দেয়ার জন্য আমাদের দায়ী এবং আলিম প্রয়োজন।

আপনাদের জানা উচিত যে, অনেক শিক্ষক এবং আলিম আফগানিস্তানে জিহাদের ময়দানে শহীদ হয়েছেন। এজন্যই আমাদের যোগ্য শিক্ষক প্রয়োজন যারা মুজাহিদীনদের বিদ্যালয়গুলিতে শিক্ষাদান এবং পরিচালনা করতে পারবে, প্রশিক্ষণ ক্যাম্প, শরণার্থী ক্যাম্প, সেনাবাহিনীকে শিক্ষাদান করবে যাতে লক্ষ্যে পৌছার জন্য আল্লাহর সাহায্য আসে। কোন উচ্চ পেশাজীবি অথবা বিশেষজ্ঞের চাইতে আমাদের আলিম এবং শিক্ষক প্রয়োজন। ইসলাম ও মুসলিমদেরকে উপরকার করার জন্য আল্লাহ আমাদের সাহায্য করুন।

আপনাদের ভাই,

আব্দুর রাব্বির রাসূল সাইয়াফ

পাকতিয়া, জামি। ৩ শাওয়াল, ১৪০৫ হিজরী।

অভিভাবক, স্বামী এবং ঋণদাতা থেকে অনুমতি প্রসঙ্গঃ

শত্রুর অবস্থার সাথে অনুমতি নেওয়ার প্রয়োজনীয়তা সম্পর্কীত।

শত্রুরা যদি তাদের নিজেদের দেশে অবস্থান করে, তারা মুসলিমদের সীমানায় এসে একত্রিত হয় নি, মুসলিম ভূমি হুমকির সম্মূখীন নয় এবং সীমানাগুলিতে যথেষ্ট মুজাহিদীন আছে -অবস্থা যদি এরকম হয় তবে সেক্ষেত্রে জিহাদ ফরজুল কিফায়া এবং উল্লেখিত শ্রেণীগুলি থেকে অনুমতি নেওয়ার অবশ্যক। কারণ অভিভাবক এবং স্বামীর আনুগত্য হচ্ছে ফরজুল আইন আর উপরোক্ত পরিস্থিতিতে জিহাদ হচ্ছে ফরজুল কিফায়া।

যদি শত্রুরা মুসলিমদের সীমানায় আক্রমণ করে অথবা মুসলিমদের ভূমির যেকোন অংশে প্রবেশ করে, সেক্ষেত্রে আমরা পূর্বে উল্লেখ করেছি যে, সমগ্র

দেশ এবং এর আশেপাশে যারা আছে তাদের সকলের উপর জিহাদ ফরজুল আইন হয়ে যায়। এই পরিস্থিতিতে উপরোক্ত শ্রেণীগুলি থেকে অনুমতি নেওয়ার প্রয়োজন নেই। কোন ব্যক্তির জন্য অপরের নিকট থেকে অনুমতি নেওয়ার প্রয়োজন নেই। এমনকি সন্তান তার অভিভাবকের নিকট থেকে, স্ত্রী তার স্বামীর নিকট থেকে, ঋণগ্রহিতা তার ঋণদাতার কাছ থেকে অনুমতি ব্যতিতই জিহাদে অংশগ্রহণ করতে পারবে।

যতক্ষণ পর্যন্ত মুসলিম ভূমি থেকে শত্রুদের বহিস্কার করা না হয় অথবা প্রয়োজনীয় সংখ্যক মুজাহিদীন সাড়া না দেয়। ততক্ষণ পর্যন্ত অনুমতি নেওয়া অবশ্যক নয়। এমনকি পৃথিবীর সমস্ত মুসলিমদের একত্রিত হওয়ার প্রয়োজনীয়তা থাকলে একত্রিত হতে হবে।

যদিও অভিভাবকের আনুগত্য করা ফরজুল আইন তারপরও এটার উপর ফরজুল আইন জিহাদ অগ্রাধিকার পাবে। কারণ জিহাদের মাধ্যমে সমগ্র দ্বীনকে রক্ষা করা হয় এবং অভিভাবকের আনুগত্যের মাধ্যমে একজন ব্যক্তির জন্য দায়িত্ব পালন করতে হয়। সুতরাং একজন ব্যক্তিকে রক্ষা করার চাইতে সমগ্র দ্বীনকে রক্ষা করা অগ্রাধিকার যোগ্য। উপরন্তু জিহাদের মাধ্যেমে যদিও একজন মুজাহিদ শহীদ হতে পারে, কিন্তু এর মাধ্যমে সমগ্র দ্বীন ধ্বংসের হাত থেকে রক্ষা পাওয়া নিশ্চিত হয়। কিন্তু একজন ব্যক্তি জিহাদে চলে গেলে তার অভিভাবক, পিতা-মাতা ধ্বংস হয়ে যাওয়াটা নিশ্চিত নয়। একারণেই অনিশ্চিত বিষয়ের উপর নিশ্চিত বিষয় প্রাধান্য পায়।

ফরজুল আইন এবং ফরজুল কিফায়ার একটি উদাহরণ:

কিছু ব্যক্তি সমুদ্র সৈকতে হাঁটছে, তাদের মধ্যে একজন সাঁতারু বিদ্যমান। তারা দেখল একজন শিশু পানিতে ডুবে যাচ্ছে এবং চিৎকার করছে, আমাকে বাচাঁও, আমাকে বাঁচাও!! বলে কিন্তু কেউ তার ডাকে সাড়া দিচ্ছে না। একজন সাঁতারু তাকে উদ্ধার করার জন্য সামনে অগ্রসর হল কিন্তু তার পিতা তাকে নিষেধ করছে। বর্তমান সময়ের কোন আলেম কি এই কথা বলবে যে, উক্ত সাঁতারুর উপর পিতার হুকুম পালন করা উচিত এবং বাচ্চাটি ডুবে যাক?

বর্তমান আফগানিস্তানের পরিস্থিতি ঠিক এরকমই। সে সাহায্যের জন্য কাঁদছে, তার বাচ্চাদের জবাই করা হচ্ছে, তার মেয়েদের ধর্ষণ করা হচ্ছে, নিরপরাধদের হত্যা করা হচ্ছে এবং তাদের ফসল ধ্বংস করা হচ্ছে। যখনই

কোন একনিষ্ঠ যুবক তাদেরকে মুক্ত করার জন্য সেখানে যেতে আগ্রহ প্রকাশ করে, তখনই তাকে সমালোচনা করা হয় এবং দোষারোপ করে বলা হয়, "কিভাবে তুমি তোমার অভিভাবকের অনুমতি ছাড়া সেখানে যাও"
ডুবন্ত শিশুকে উদ্ধার করা সমস্ত সাঁতারুর জন্য ছিল ফরজ। যেকোন একজন সাঁতারু অগ্রসর হওয়ার আগ পর্যন্ত শিশুটিকে মুক্ত করার দায়িত্ব সকলের উপর ছিল। একজন যদি তাকে মুক্ত করার জন্য অগ্রসর হয়, তখন অন্য সবাই গুনাহ থেকে দায় মুক্ত হয়ে যায়, কিন্তু কোন একজন অথবা যথেষ্ট সংখ্যক ব্যক্তি যদি শিশুটিকে উদ্ধার করার জন্য অগ্রসর না হয়, তাহলে তখন সকলেই গুনাহের অংশিদার হয়ে যায়।

যে কোন একজনের অগ্রসর হওয়ার আগ পর্যন্ত কোন অনুমতির প্রয়োজন নেই। এমনকি শিশুটিকে উদ্ধার করার জন্য কোন অভিভাবক যদি তার সন্তানকে নিষেধ করে তবে অবশ্যই সে অভিভাবককে অমান্য করতে হবে। এটি এই কারণে যে, প্রাথমিক অবস্থায় ফরজুল কিফায়ার দিকে আহ্বান এবং ফরজুল আইনের দিকে আহ্বানের মধ্যে কোন পার্থক্য নেই। পার্থক্য এটুকুই যে, ফরজুল কিফায়ার জন্য প্রয়োজনীয় সংখ্যক ব্যক্তি জোগাড় হলে বাকী সবাই দায়মুক্ত হয়ে যায়। আর যদি কেউ সাড়া না দেয় তবে সবাই গুনাহগার। ইবনে তাইমিয়্যাহ রহ. বলেছেন: যদি শত্রু আক্রমণ করে তখন তর্কের কোন অবকাশ নেই। প্রকৃতপক্ষে দ্বীন, জীবন এবং সমস্ত প্রিয় জিনিস রক্ষা করা যে ফরজ -এই ব্যাপারে সবাই একমত প্রকাশ করেছেন।[৪৯]

ফরজুল কিফায়ার ক্ষেত্রে অনুমতি নেওয়ার প্রয়োজনীয়তা এবং ফরজুল আইনের ক্ষেত্রে অনুমতি নেওয়ার প্রয়োজনীয়তার বিধান নেওয়া হয়েছে দু'টি হাদিসের মধ্যে সামঞ্জস্য করার মাধ্যমে:

প্রথম হাদীস:

عن عبدالله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما: جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم يستأذنه في الجهاد فقال: (أحي والداك؟)، قال: نعم، قال: (ففيهما فجاهد).

[৪৯] আল ফাতওয়া আল কুবরা ৪/৬০৭।

অর্থ: "হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে আমর বিন আস রা. বলেছেন, "এক ব্যক্তি জিহাদে যাওয়ার অনুমতির জন্য রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর নিকট আসল। তিনি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম জিজ্ঞেস করলেন তোমার পিতা-মাতা জীবিত আছে? ব্যক্তিটি উত্তর দিল হ্যাঁ। তিনি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বললেন যাও তাদের সেবা কর, তাদের মধ্যেই তোমার জিহাদ।"[৫০]

দ্বিতীয় হাদীস:

روى ابن حبان عن عبدالله بن عمرو رضي الله عنهما: جاء رجل الى رسول الله صلى الله عليه وسلم فسأله عن أفضل الأعمال قال: (الصلاة)، قال: ثم مه قال: (الجهاد)، قال: فإن لي والدين، فقال: (آمرك بوالديك خيرا)، فقال: والذي بعثك بالحق لأجاهدن وأتركهما، قال: (فأنت أعلم)

ইবনে হিব্বান আব্দুল্লাহ ইবনে আমর রা. থেকে বর্ণনা করেছেন, এক ব্যক্তি রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর কাছে এসে সবচেয়ে উত্তম আমলের কথা জিজ্ঞেস করল। তিনি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বললেন, সালাত। লোকটি আবার জিজ্ঞেস করল, অতঃপর কোনটি? তিনি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বললেন, জিহাদ ফি সাবিলিল্লাহ। লোকটি তখন বলল, আমার দু'জন পিতা-মাতা আছে। তিনি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাকে বললেন, আমি তোমাকে আদেশ করছি তাদের মাধ্যমে কল্যাণ অর্জন করতে। লোকটি উত্তর দিল, যিনি আপনাকে সত্যসহ পাঠিয়েছেন তাঁর শপথ, আমি জিহাদ করবো এবং তাদেরকে পরিত্যাগ করবো। তিনি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বললেন, তুমি ভালো জান।[৫১]

ইবনে হাজার রহ. বলেছেন, এখানে বুঝতে হবে যে, (দ্বিতীয় হাদীসে) জিহাদ ছিলো ফরজুল আইন। এটিই এই দুই হাদীসের মধ্যে সামঞ্জস্য।[৫২]

---

[৫০] বুখারী।
[৫১] ফাতহুল বারী ৬/১০৬।
[৫২] ফাতহুল বারী ৬/১০৬।

শাইখ ও শিক্ষক এর নিকট থেকে অনুমতি প্রসঙ্গঃ

ইবাদত করার জন্য শাইখ অথবা শিক্ষকদের নিকট থেকে অনুমতি নেওয়ার কোন দলীল প্রমাণ নেই। এই ইবাদত ফরজুল আইন অথবা ফরজুল কিফায়া যা-ই হোক না কেন। এই ব্যাপারে কোন সালাফুস সালেহ হতে কোনো উদ্ধৃতি নেই। যে ব্যক্তি এর বিপরীত কিছু বলবে তাকে অবশ্যই পরিস্কার দলিল প্রমাণ হাজির করতে হবে। প্রত্যেক মুসলিম তার শাইখ অথবা শিক্ষকের অনুমতি ব্যতীত জিহাদে রওয়ানা দিতে পারবে। রব্বুল আলামীন এর নিকট থেকে পাওয়া অনুমতি সবার উপরে অগ্রাধিকার পাবে। তিনি তো অনুমতি দিয়েই রেখেছেন। অধিকন্তু তিনি এটা ফরজ করেছেন।

ইবনু হুবাইর বলেছেন, "শয়তানের একটি চক্রান্ত হচ্ছে 'আল্লাহর সাথে মূর্তির ইবাদতের ব্যাপারে যে ধোঁকা দেয়। যখন সত্য প্রমাণিত হয় তখন সে ওয়াস ওয়াসা দেয়, 'এটি আমাদের মতের অনুরূপ নয়'। সুতরাং এভাবে সত্যের উপর একজন ব্যক্তির মতামতকে অগ্রাধিকার দেয়ার মাধ্যমে সে বাতিল ইলাহের ইবাদত করে।"

ধরুন, কেউ আমেরিকাতে ইঞ্জিনিয়ারিং, ডাক্তারি অথবা ইতিহাস নিয়ে লেখাপড়া করতে যেতে চায়। যেখানে ফাসাদ অন্ধকার রাত্রির মত বিস্তৃত। ওয়াস ওয়াসা তাকে সমুদ্রের তরঙ্গের মত ঘিরে ধরবে। এই লোকেরা যদি তাদের শাইখ এর নিকট হতে অনুমতি গ্রহণ না করে তবে সে অথবা অন্য কেউ রাগান্বিত হয়না। অথচ সে যদি জিহাদের ভূমিকে প্রতিরক্ষা করতে বের হয় তখন প্রতিটি ব্যক্তি তার দিকে আঙ্গুল তুলে বলে, "সে কিভাবে অনুমতি ব্যতীত যেতে পারে? উক্ত শাইখ রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর বাণী ভুলে গেছে,

حرس ليلة في سبيل الله تعالى أفضل من ألف ليلة يقام ليلها ويصام نهارها.

অর্থ: "এক রাত আল্লাহর পথে 'রিবাত' -এ (ইসলামী ভূমির সীমানায় প্রহরায়) ব্যয় করা, হাজার রাত সালাত এ দাড়িয়ে থাকা ও সিয়াম রাখার চেয়ে উত্তম।"[৫৩]

আরো ইরশাদ হয়েছে,

---

[৫৩] ইবনে মাজাহ, আত তাবারানী, আল ফাতহুর রাব্বানী- ১০/৯৫।

رباط يوم وليلة خير من صيام شهر وقيامه، وإن مات جرى عليه عمله الذي كان يعمل وأجري عليه رزقه وأمن الفتان غدوة في سبيل الله أو روحة خير من الدنيا وما فيها.

অর্থ: "একদিন ও একরাত 'রিবাত' (সীমানা পাহারা দেয়া)-এ থাকা একমাস সিয়াম রাখা ও সালাত পড়ার চেয়ে উত্তম। সে যদি 'রিবাত' এ থাকা অবস্থায় মারা যায় তবে মৃত্যুর পরও তার আমল চালু থাকবে, সে রিযিকপ্রাপ্ত হবে এবং সে ফিতনা থেকে মুক্ত থাকবে।"[৫৪] আরো ইরশাদ হয়েছে,

عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِك رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَغَدْوَةٌ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَوْ رَوْحَةٌ خَيْرٌ مِنْ الدُّنْيَا وَمَا فِيهَا.

অর্থ: "আনাস ইবনে মালেক রা. থেকে বর্ণিত তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, আল্লাহর পথে একটি সকাল বা একটি সন্ধ্যা অতিবাহিত করা দুনিয়া এবং এর মধ্যে যা কিছু আছে তার থেকেও উত্তম।"[৫৫]

শাইখ ও তার অনুসারীদের দায়িত্ব হচ্ছে উত্তম আমলের দিকে দ্রুত অগ্রসর হওয়া। রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন,

إغتنم خمسا قبل خمس: حياتك قبل موتك، وصحتك قبل سقمك، وفراغك قبل شغلك، وشبابك قبل هرمك، وغناك قبل فقرك.

অর্থ: "৫টি জিনিসের পূর্বে ৫টি জিনিসের সুযোগ গ্রহণ কর।
১। তোমার মৃতুর পূর্বে তোমার জীবন,
২। অসুস্থতার পূর্বে সুস্থতা,
৩। ব্যস্ততার পূর্বে অবসর সময়,
৪। বৃদ্ধ হওয়ার পূর্বে যৌবন,
৫। দারিদ্রতার পূর্বে সচ্ছলতা।"[৫৬]

তাদের আরও গভীরভাবে নিম্নের হাদীসের প্রতি গভীর মনোযোগ দেয়া উচিত, রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন,

---

[৫৪] মুখতাসার মুসলিম, হাদীস নং ১০৭৫।
[৫৫] সহীহ বুখারী ২৭৯২; সহীহ মুসলিম ৪৯৮১; সুনানে তিরমিজি ১৬৫১।
[৫৬] আল হাকিম, বায়হাকী, সহীহ আল জামে' ১০৮৮।

قيام ساعة في الصف للقتال في سبيل الله خير من قيام ستين سنة.

অর্থ: "যুদ্ধের ময়দানে এক মুহূর্ত দাঁড়িয়ে থাকা ষাট বছর রাতের সালাত থেকে উত্তম।"[৫৭]

ইমাম শাফিঈ রহ. বলেছেন, "এই ব্যাপারে সকলে একমত পোষণ করেছেন যে, যদি সুন্নাহ তোমার সামনে পরিস্কার হয়ে যায় তখন কোন ব্যক্তির কথায় সুন্নাহ পরিত্যাগ করা জায়েজ নয়।"

সম্পদ দ্বারা জিহাদ করা:

কোন সন্দেহ নেই যে, মাল দ্বারা জিহাদ করার চাইতে জান দ্বারা জিহাদ করা উত্তম। এজন্যই রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর যুগে ধনী সাহাবীগণ যেমন উসমান রা. আব্দুর রহমান ইবনে আউফ রা. এর মত সাহাবীগণও জান দ্বারা জিহাদ করা থেকে অবকাশ পাননি। কারণ আত্মার পরিশুদ্ধি ও উন্নতি হয় জিহাদের ময়দানে। এর জন্যই রাসূল সাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম একজন সাহাবিকে উপদেশ দিচ্ছিলেন,

...وعليك بالجهاد فإنه رهبانية الإسلام.

অর্থ: "...জিহাদকে আকঁড়ে ধর কেননা এটিই হচ্ছে ইসলামের 'রাহবানিয়্যাত' (সন্ন্যাসব্রত)।"[৫৮]

এজন্যই রাসূল সাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে প্রশ্ন করা হয়েছিল যে,

أيفتن المرء في قبره؟ قال: (كفى ببارقة السيوف على رأسه فتنة

অর্থ: "একজন শহীদকে কী কবরের ফিতনায় ফেলা হবে? তিনি সাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম উত্তর দিলেন, "তার মাথার উপর তরবারির আঘাতই তার জন্য ফিতনা (পরীক্ষা) হিসেবে যথেষ্ট।"[৫৯]

অধিকন্তু রাসূল সাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম জিহাদকে পরিত্যাগ করে দুনিয়ার প্রতি ঝুঁকতে নিষেধ করেছেন। একদা তিনি লাঙ্গলকে লক্ষ্য করে বললেন,

لا يدخل هذا بيت قوم إلا أدخله الله الذل.

---

[৫৭] আহমাদ, আল হাকেম, আদ দারেমী সহীহ। সহীহ আল জামিউস সাগীর -৪৩০৫।

[৫৮] মুসনাদে আহমাদ, সহীহ আল জামিউস সাগীর -৪৩০৫।

[৫৯] সুনানুন নাসাঈ, সহীহ, সহীহ আল জামিউস সাগীর -৪৩৫৯।

অর্থ: "এটি মানুষের বাড়িতে আসা যাওয়া করে যতক্ষণ পর্যন্ত না আল্লাহ এর দ্বারা লাঞ্ছনা প্রবেশ করান।"[৬০]

এছাড়াও বিশুদ্ধ হাদীসে এসেছে,

إذا تبايعتم بالعينة وأخذتم أذناب البقر ورضيتم بالزرع وتركتم الجهاد سلط الله عليكم ذلا لا ينزعه حتى ترجعوا إلى دينكم.

অর্থ: "যখন তোমরা কেবল ব্যবসা বাণিজ্য নিয়ে ব্যস্ত হয়ে পড়বে, গরুর লেজের (দুনিয়ার) পেছনে ছুটবে, ক্ষেত-খামারী কৃষি কাজ নিয়ে ব্যস্ত হয়ে পড়বে এবং আল্লাহর পথে জিহাদ করা ছেড়ে দিবে তখন আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলা তোমাদের উপর লাঞ্ছনা চাপিয়ে দিবেন। আর ততক্ষণ তিনি এই লাঞ্ছনা তুলে নিবেন না, যতক্ষণ পর্যন্ত না তোমরা তোমাদের আসল দীনের (জিহাদের) প্রতি ফিরে আসবে।"[৬১]

আরেকটি সহীস হাদীসে এসেছে,

لا تتخذوا الضيعة فترغبوا في الدنيا) (والضيعة: هي العقار أو الحرفة.)

অর্থ: "তোমরা 'দাইয়া' গ্রহণ করো না কারণ এটা তোমাদেরকে দুনিয়ার জীবন এর উপর সন্তুষ্ট করে রাখবে।"[৬২]

রাসূল সাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম দুনিয়াকে বর্জন করার উপায় বলে দিয়েছেন। যেমনঃ কৃষি, সূদের ব্যবসা, য়ি'নায় ব্যবসা, পশুপাখির খামার, শিল্প কারখানা ও উঁচু দালান ইত্যাদি বর্জনের মাধ্যেম। শরীয়াহ অনুযায়ী ইসলাম যখন আক্রান্ত তখন উক্ত কাজগুলির মধ্যে ব্যস্ত হওয়া হারাম এবং অনেক বড় গুনাহ।

যদি মুজাহিদীনদের মালের প্রয়োজন হয় তখন একজনের মাল দ্বারা জিহাদ করা ফরজ। তখন মহিলা ও শিশুর মাল দ্বারা জিহাদ করাও ফরজ, এটি ইবনে তাইমিয়্যাহ রহ. বলেছেন।[৬৩]

---

[৬০] সহীহ বুখারী, সিলসিলাতুল আহাদীস আস সাহীহাহ -১০।
[৬১] সুনান আবু দাঊদ, অধ্যায়- ২৩, হাদীস নং ৩৪৫৫; সহীহ আল-জামী', হাদীস নং- ৬৮৮; আহমদ, হাদীস নং ৪৮২৫। মুসনাদ ইবনে উমার, হাদীস নং- ২২।
[৬২] আত-তিরমিযী, সিলসিলা আল-হাদীস আস-সহীহ-১২।
[৬৩] আল ফাতাওয়া আল কুবরা -4/৬০৮।

এজন্যই জিহাদে যখন মালের প্রয়োজন হবে তখন মাল জমা রাখা হারাম। ইবনে তাইমিয়্যাহ রহ.-কে প্রশ্ন করা হয়েছিল, "আমাদের কাছে এত সামান্য মাল আছে যে, হয় দুর্ভিক্ষ পীড়িতদের মাঝে খরচ করতে হবে অথবা জিহাদে ব্যয় করতে হবে। এ ক্ষেত্রে আমরা কী করবো? তিনি বলেছিলেন,

قدمنا الجهاد وإن مات الجياع، كما في مسألة التترس وأولى، فإن هناك – التترس – نقتلهم بفعلنا وهنا يموتون بفعل

অর্থ: "যদি দুর্ভিক্ষে পীড়িতরা মারাও যায় তবুও আমরা জিহাদকে অগ্রাধিকার দিব। মুসলিমদেরকে যখন শত্রুরা বর্ম হিসাবে ব্যবহার করে তখন ঐ মুসলিমরা আমাদের হাতে নিহত হয় অথচ এখানে দুর্ভিক্ষ পীড়িতরা আল্লাহর হুকুমের অধীনে মারা যায়।"[৬৪]

ইমাম কুরতুবী রহ. বলেছেন, বলেছেন,

إتفق العلماء على أنه إذا نزلت بالمسلمين حاجة بعد أداء الزكاة فإنه يجب صرف المال إليها.

অর্থ: "আলিমগণ একমত পোষন করেছেন যে, যাকাত পরিশোধের পরও যদি মুসলিমদের কোন প্রয়োজন থাকে; তবে তারা নিজেদের মাল থেকে খরচ করবে উক্ত প্রয়োজন পূরণ করার জন্য।"[৬৫]

ইমাম মালিক রহ. বলেছেন,

يجب على الناس فداء أسراهم وإن استغرق ذلك أموالهم. وهذا إجماع أيضا.

অর্থ: "মুসলিম বন্দিদের মুক্ত করা ফরজ। যদিও সমস্ত সম্পদ খরচ হয়ে যায়। এ ব্যাপারে সবাই একমত পোষণ করেছেন।"[৬৬]

একজন ব্যক্তিকে রক্ষার চাইতে দ্বীনকে রক্ষা করা অগ্রাধিকারযোগ্য এবং সম্পদকে রক্ষার চাইতে একজন মানুষের জীবন রক্ষা করা অগ্রাধিকারযোগ্য। সুতরাং একজন মুজাহিদীন এর রক্তের চাইতে একজন ধনীর সম্পদ বেশি মূল্যবান নয়।

---

[৬৪] ফাতাওয়া আল কুবরা- ৪/৬০৮।
[৬৫] আল-কুরতুবী-২/২৪২।
[৬৬] আল-মালিকী-২/২৪২।

সুতরাং হে ধনীগণ! তোমরা মালের ক্ষেত্রে আল্লাহর হুকুমের ব্যাপারে সর্তক হও। যেখানে মুসলিম দেশগুলো শেষ হয়ে যাচ্ছে সেখানে ধনীরা তার মাল দিয়ে নফসের খাহেশাতের মধ্যে ডুবে আছে। আফসোস!! যদি এই ধনীরা মাত্র একদিন তাদের নফসের খাহেশাত থেকে দূরে থাকত এবং মালের অপচয় বন্ধ করে সমস্ত টাকা আফগানিস্তানের মুজাহিদীনদের নিকট পাঠাতো, যাদের পাগুলো বরফে ক্ষয়ে যাচ্ছে এবং ঠান্ডায় মারা যাচ্ছে। তারা দিনে খাবার পায়না এবং নিজেদের রক্ষার জন্য পর্যাপ্ত অস্ত্রও পায় না।

আমি বলি, যদি ধনীরা তাদের একদিনের অপচয়ের টাকা আফগানিস্তানে ব্যয় করত তবে মুজাহিদীনরা আল্লাহর সাহায্যে বিজয় লাভ করতো। অধিকাংশ আলিম, তম্মধ্যে উল্লেখযোগ্য হচ্ছেন শাইখ বিন বায তারা ফাতওয়া দিয়েছেন যে, মুজাহিদীনদের মধ্যে যাকাত ব্যয় করা হচ্ছে সবচেয়ে উত্তম আমল ও উত্তম সাদাকা।

সারাংশঃ

একঃ পৃথিবীর প্রতিটি মুসলিম এর জন্য নিজের জীবন দ্বারা জিহাদ করা ফরজুল আইন।

দুইঃ জিহাদ করার জন্য একজন অপরজন থেকে অনুমতির প্রয়োজন নেই। সন্তানের জন্য পিতার নিকট থেকে অনুমতির প্রয়োজন নেই।

তিনঃ মাল দ্বারা জিহাদ করা ফরজুল আইন এবং জিহাদের জন্য মালের প্রয়োজন হলে সে পরিস্থিতিতে মাল জমা করা হারাম।

চারঃ জিহাদকে অগ্রাহ্য করা সালাত এবং সিয়ামকে আগ্রাহ্য করার মতই ক্ষমার অযোগ্য অপরাধ। আর বর্তমানে জিহাদকে আগ্রাহ্য করা আরও নিকৃষ্ট। ইবনে রুশদ ওয়ালিদ বিন আহমাদ বলেছেন, এব্যাপারে ইজমা রয়েছে যে, যখন জিহাদ ফরজুল আইন হয়, তখন এই ফরজ হজ্জের চাইতেও অগ্রাধিকার পাবে।"

৪র্থ অধ্যায় ঃ খুবই গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্ন

বর্তমান সময়ে আমরা কি এই ফাতওয়াটি পূর্ণভাবে পালন করতে পারি?
সব কিছু শোনার পর কেউ হয়তবা বলতে পারেঃ হ্যা, ঠিক আছে। আমরা জানতে পারলাম যে, সালাত ও সিয়াম যেমন ব্যক্তিগতভাবে ফরজ (ফরজ) ঠিক তেমনি বর্তমানে জিহাদ করাও ফরজুল আইন। এমনকি জিহাদের গুরুত্ব সালাত ও সিয়ামের চাইতেও বেশি। যেমন ইবনে তাইমিয়্যাহ রহ. বলেছেন, "ঈমান আনার পর সর্বপ্রথম ফরজ কাজ হচ্ছে, মুসলিমদের ভূমি থেকে আগ্রাসী শত্রুদের বহিস্কার করে দেয়া যারা দ্বীন এবং দুনিয়ার বিষয়ে (Worldy affaies) উপর আক্রমণ করে।[৬৭]

জিহাদের সময় সালাত দেরিতে পড়া যায়। একত্রে পড়া যায় প্রয়োজনের সময় রাকআত সংখ্যা পর্যন্ত কমে যায়। দুটি সহীহ হাদীসে এসেছে,

ملأ الله بيوتهم وقبورهم نارا كما شغلونا عن الصلاة الوسطى حتى غابت الشمس.

অর্থঃ "আল্লাহ তাদের বাড়িঘর এবং কবর আগুনের দ্বারা পরিপূর্ণ করে দিক যারা আমাদেরকে ব্যস্ত রেখেছে যার কারণে আমরা মধ্যবর্তী সালাত আদায় করতে পারিনি এমনকি সূর্য ডুবে গেছে।"[৬৮]

এবং একজন মুজাহিদ সিয়াম ভঙ্গ করতে পারবে জিহাদের সময়। যেমন মুসলিম থেকে বর্ণিত, রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ফাতহে মক্কার (মক্কা বিজয়ের) সময় সিয়াম ভেঙ্গে ছিলেন এবং বলেছিলেন যে,

إنكم مصبحوا عدوكم والفطر أقوى لكم فأفطروا

অর্থঃ "তোমরা সকালে শত্রুর মুখোমুখি হতে যাচ্ছ। সিয়াম ভঙ্গের মাধ্যমে শক্তিশালী হতে পারবে। সুতরাং সিয়াম ভঙ্গ কর।"[৬৯]
এটি আমাদের সামনে পরিস্কার হয়ে গেছে যে, জিহাদ যখন ফরজে আইন হয়ে যায়, তখন তা পালন করার জন্য কারও অনুমতির প্রয়োজন নেই। ঠিক তেমনি **যেমন** সূর্যোদয়ের পূর্বে সালাত আদায়ের জন্য পিতা, শাইখ, মনিব এর কাছ

---

[৬৭] **ফাতওয়া আল কুবরা**- ৪/৬০৮।
[৬৮] **আল-বুখারী, মুসলিম**।
[৬৯] মুসলিম।

থেকে অনুমতির প্রয়োজন হয়না। একইভাবে ফরজ জিহাদের ক্ষেত্রে কোন অনুমতির প্রয়োজন নেই।

উদাহরণ স্বরূপঃ এক রাত্রে পিতা এবং পুত্র একত্রে কোন স্থানে ঘুমাচ্ছে। পুত্র ফজর এর সালাত পড়তে চাচ্ছে কিন্তু পিতা ঘুমাচ্ছে। এমতাবস্থায় কেউ কি উপদেশ দিবেন যে পুত্রকে অবশ্যই সালাত পড়ার জন্য অনুমতি নিতে হবে? শুধু তাই নয়, পিতা যদি কোন কারণবশত (যারা সালাত না পড়ে ঘুমাচ্ছে তাদের ঘুম যাতে নষ্ট না হয়) সালাত পড়তে মানা করে তবে কি পুত্র এই আদেশ মানবে? নিম্নোক্ত হাদীস দ্বারা উত্তরটি খুবই স্পষ্ট।

إنما الطاعة في المعروف

অর্থঃ "আনুগত্য সৎ কাজে।"[৭০]

لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق

অর্থঃ "স্রষ্টার অবাধ্যতা সৃষ্টির কোন আনুগত্য নেই।"[৭১] এবং

طاعة لمن لم يطع الله

অর্থঃ "তার ক্ষেত্রে কোন আনুগত্য নেই যে আল্লাহর আনুগত্য করেনা"[৭২]

উপরোল্লেখিত আলোচনা হতে এটি সন্দেহাতীতভাবে প্রমাণিত হলো যে, জিহাদকে উপেক্ষা করা সীমাহীন গুনাহের কাজ এবং স্রষ্টার অবাধ্যতার ক্ষেত্রে সৃষ্টির কোন আনুগত্য করা যাবে না।

অনুমতি প্রসঙ্গঃ

অনুমতি নিতে হবে কিনা এই প্রশ্নোত্তরে আমরা আল্লাহর সাহায্যে বলতে চাই, যখন জিহাদের পতাকা উত্তোলন করা হয়েছিল এবং উম্মাকে জিহাদের জন্য আহ্বান করা হয়েছিল তখন সাহাবায়ে কিরাম রা. কোনদিন অনুমতি চান নি। বরং রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর কাছে অনুমতি চাওয়া এবং পরামর্শ করতে শুধু সেই এসেছিল যে ব্যক্তিগতভাবে সিদ্ধান্ত নিয়েছিল জিহাদে যাওয়ার জন্য অথবা যে কোন জিহাদের যাওয়ার জন্য নাম লিখিয়েছিল।

---

[৭০] আল-বুখারী, মুসলিম কর্তৃক বর্ণিত। সহীহ আল-জামী' আস-সাগীর-৩৯৬৭।
[৭১] হাদীস সহীহ আহমদ ও হাকিম, সহীহ আল জামি আস-সাগীর হাদীস নং, ২৩২৩
[৭২] আহমেদ, সহীহ, সহীহ আল-জামী' আস-সাগীর-৭৩৯৭

عن معاوية بن جاهمة السلمي أن جاهمة أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، أردت الغزو وجئتك أستشيرك، فقال: هل لك من أم؟ فقال: نعم، فقال: إلزمها فإن الجنة عند رجليها.

অর্থ: "মুয়াউইয়া বিন জাহিমা আস সালমি থেকে বর্ণিত মুসনাদে আহমদ ও নাসাঈ কর্তৃক সংকলিত, জাহিমা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর কাছে আসল এবং বলল, ইয়া রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম! আমি একটি গাযওয়াতে অংশগ্রহণ করতে চাই এবং এ ব্যাপারে আপনার সাথে পরামর্শ করতে এসেছি। তিনি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বললের মার সাথে থাকো, কারণ জান্নাত তার পায়ের নিচে।"[৭৩]

অন্য বর্ণনায় এসেছে, "অমুক এবং অমুক জিহাদের জন্য আমার নাম লিখানো হয়েছে" অর্থাৎ "আমি স্বাক্ষর দিয়েছি"। আর এটি ছিল সেই সময়ের ঘটনা যখন জিহাদ ফরজুল কিফায়া ছিল।

কিন্তু আহ্বান করার পর জিহাদ যখন ফরজুল আইন হয়ে যায় তখন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের কাছে অনুমতি চাইতে আসা পরিস্কার নিফাক এর চিহ্ন। কারণ এই ক্ষেত্রে সুনির্দিষ্ট আয়াত নাযিল হয়েছে।

لا يَسْتَأْذِنُكَ الَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ أَنْ يُجَاهِدُوا بِأَمْوَالِهِمْ وَأَنْفُسِهِمْ وَاللَّهُ عَلِيمٌ بِالْمُتَّقِينَ. إِنَّمَا يَسْتَأْذِنُكَ الَّذِينَ لا يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَارْتَابَتْ قُلُوبُهُمْ فَهُمْ فِي رَيْبِهِمْ يَتَرَدَّدُونَ.

অর্থ: "যারা আল্লাহ ও আখিরাত দিবসে ঈমান রাখে, তারা তোমার কাছে তাদের মাল ও জান দিয়ে জিহাদ করা থেকে বিরত থাকার অনুমতি চাইবে না, আর আল্লাহ মুত্তাকীদের সম্পর্কে পূর্ণ জ্ঞাত।
জিহাদ থেকে বিরত থাকার অনুমতি তো তারাই চাইবে মাত্র সেসব লোক অনুমতি চায় যারা আল্লাহ ও আখিরাত দিবসে ঈমান রাখে না, আর তাদের অন্তরসমূহ সংশয়গ্রস্ত হয়ে গেছে। সুতরাং তারা তাদের সংশয়েই ঘুরপাক খেতে থাকে।"[৭৪]

---

[৭৩] আহমেদ, নাসাঈ, সহীহ নাইল আল-আউতার-৮/৩৭।
[৭৪]

খোলাফায়ে রাশেদীন (হিদায়াত প্রাপ্ত খলিফাগণ) যেমনঃ আবু বকর, উমার, উসমান, আলী রা. এর ব্যাপারে আমরা এমন কোন উদাহরণ পাই না যে, তখনকার সময় সহাবাগণ অথবা তাবেঈগণ জিহাদ থেকে বিরত থাকার অনুমতি চেয়েছেন। তখন প্রত্যেক ব্যক্তি (যে কেউ) যদি জিহাদ করতে চাইতো তবে তারা আবু বকর রা. এর কাছে অনুমতির জন্য আসতো না। সবেচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ ব্যাপার হচ্ছে জিহাদের পতাকা অবশ্যই তুলতে হবে এবং বাহিনী প্রেরণ করতে হবে।

উপরন্তু খলীফাদের পর আমীরুল মু'মিনীনদের নিকট থেকেও এমন কোন প্রমাণ পাওয়া যায় না যে, যে ব্যক্তি জিহাদে অথবা রিবাতে অংশগ্রহণ করতে চাইতো তাকে অনুমতি নিতে হতো। এমনকি ইসলামের ইতিহাসে পর্যন্ত এমন কোন প্রমাণ পাওয়া যায় না যে, কেউ অনুমতি ছাড়া জিহাদে অথবা গাযওয়াতে অংশগ্রহণ করার জন্য শাস্তিপ্রাপ্ত হয়েছে। প্রকৃতপক্ষে আমীরুল জিহাদ এর কাছ থেকে অনুমতি নেয়া প্রয়োজন যাতে যুদ্ধে বিশৃঙ্খলা না হয়, পরিকল্পনা নষ্ট না হয়ে যায়।

ইমাম আওযায়ী রহ. বলেছেন, "শুধুমাত্র বেতনপ্রাপ্ত সৈনিকদের জন্য অনুমতির প্রয়োজন ইমামের নিকট থেকে।"
আর-রামলি রা. নিহায়াতুল মুহতাজ এর (৮/৬০ নং পৃষ্ঠায়) বলেছেন, "ইমাম অথবা তার সেকেন্ড ইন কমান্ড এর অনুমতি ছাড়া কোন অভিযানে অংশগ্রহণ করা মাকরুহ। তাও আবার তিন ক্ষেত্রে ছাড়াঃ
১। যদি অনুমতির কারণে জিহাদে লক্ষ্য নষ্ট হয়ে যায়।
২। ইমাম যদি কারণ ছাড়া (অথবা ভুল কারণে) অভিযান বন্ধ করে দেয়।
৩। কেউ যদি চিন্তা করে অনুমতি নিতে গেলে কর্তৃপক্ষ অন্যায়ভাবে তাকে প্রত্যাখ্যান করবে। -এই বিষয়গুলোতে (সিরাজুদ্দীন উমার) বালকিনীও একমত পোষণ করেছেন।

আমরা বলতে চাই এতসব কিছু বিবেচনার বিষয় তখন, যখন জিহাদ ফরজুল কিফায়া। কিন্তু জিহাদ যখন ফরজুল আইন তখন কোন অনুমতির প্রয়োজন নেই। ইবনুর রুশদ বলেছেন,

طاعة الإمام لازمة وإن كان غير عدل ما لم يأمر بمعصية، ومن المعصية النهي عن الجهاد المتعين.

অর্থ: "ইমাম যদি যুলুমও করে তবুও তাকে অবশ্যই আনুগত্য করতে হবে। যতক্ষণ সে গুনাহের আদেশ না করে। ফরজুল আইন জিহাদ থেকে নিষেধ করা গুনাহ এর আদেশ।"[৭৫]

এই বিষয়ে আরো পরিস্কারভাবে ঘোষণা করছি: অনুমতি শুধুমাত্র ফরজুল কিফায়া এর ক্ষেত্রে প্রয়োজন। তাও আবার যথেষ্ট সংখ্যক সৈন্য অংশ গ্রহণ করার পর (যত সংখ্যক অংশগ্রহণ করলে উক্ত ফরজ দায়িত্ব পালন করা সম্ভব)। কিন্তু যথেষ্ট সংখ্যক সৈন্য অংশ গ্রহণ করার পূর্বে এটি সবার কাঁধের উপর ফরজ দায়িত্ব হিসাবে থাকবে। ফরজুল আইন ও ফরজুল কিফায়ার মধ্যে কোন পার্থক্য নেই যথেষ্ট সংখ্যক অংশগ্রহণ করার আগ পর্যন্ত।
এতসব কিছু জানার পর কেউ হয়তো বলবেন,
আমরা জানতে পারলাম জিহাদ হচ্ছে ফরজুল আইন এবং কোন অনুমতির প্রয়োজন নেই কিন্তু তারপরও কিছু গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্ন থেকে যায়।

১ম প্রশ্ন: বর্তমানে আমরা কিভাবে একটি সাধারণ অভিযান' বাস্তবায়িত করতে পারি?

কিছু মানুষ বলে যে, 'সাধারণ অভিযান' যা ইসলামে আবশ্যকীয়, যেখানে মহিলা স্বামীর অনুমতি ব্যতীত, সন্তানরা পিতার অনুমতি ব্যতীত বের হতে পারে। কিছু কারণে এই অভিযানে বের হওয়া খুবই কঠিন:
যেখানে অভিযান করা হবে সেখানে হাজার হাজার মুসলিমদের মধ্যে থেকে এক ভাগ মুসলিমদের জন্যও জায়গা সংকুলান হবে না।

এই অভিযানের কারণে ইসলামী শিক্ষাব্যবস্থা ক্ষতিগ্রস্থ হবে এবং ইসলামী ভূমিগুলো থেকে মানুষ খালি হয়ে যাবে। সুতরাং প্রত্যেকে যদি জিহাদের জন্য আফগানিস্তান ও ফিলিস্তিনে চলে যায় তবে সমস্ত মুসলিম ভূমি খালি হয়ে যাবে ফলশ্রুতিতে কম্যুউনিষ্ট, বার্থিষ্ট, জাতীয়তাবাদী, সেক্যুলারিষ্টরা ভূমিগুলো দখল করে ফেলবে।

---

[৭৫] ফাত্হ আল-আলী আল-মালিকী কর্তৃক সহীহ আলিশ-১/৩৯০।

উত্তরঃ

যদি মুসলিম বিশ্ব আল্লাহর হুকুম অনুযায়ী ফিলিস্তিনে এক সপ্তাহের জন্য সাধারণ অভিযান পরিচালনা করতো তবে সর্ম্পূন ফিলিস্তিনই ইহুদী মুক্ত হয়ে যেত। একইভাবে আফগানিস্তানের সমস্যাও এতোদিন থাকত না। অধিকন্তু দা'য়ীগণ নিঃশেষ হতনা। বরং আমরা শুধু অপেক্ষা করছি ও কান্না করছি। আমাদের চোখের সামনে কাফিররা আমাদের দেশগুলি দখল করছে এবং এভাবে হয়ত সম্পূর্ণ মুসলিম বিশ্বকে তারা দখল করে ফেলবে পরিশেষে আমরা প্রচুর কাঁদব। অপ্রত্যাশিতভাবে আমরা ইসলামকে নিয়ে চিন্তা করি জাতীয়তা ভিত্তিক। কাফিররা যে দেশের সীমানা এঁকে দিয়েছে তার বাইরে আমরা চিন্তা করতে পারিনা।

উদাহরণ স্বরূপঃ

জর্দানের মধ্যে দু'টি এলাকা আছে। একটি হচ্ছে আর-রামশাহ যা সিরীয় সীমানার নিকটে অবস্থিত। অপরটি হচ্ছে আকাবা যা আর-রামশাহ্ হতে ৬০০ কিঃমিঃ দূরে অবস্থিত। আর-রামশাহ্ এর অধিবাসীরা দারা-এর অধিবাসীদের চাইতেও আকাবার অধিবাসীদের বেশি ঘনিষ্ঠ মনে করে। যদিও উভয় অধিবাসীরাই মুসলিম উপরন্তু দারা-র অধিবাসীরা বেশি ধার্মিক।

২য় প্রশ্নঃ আমরা কি একজন ইমাম ব্যতীত জিহাদ করতে পারি?

উত্তরঃ হ্যাঁ, আমরা ইমাম ব্যতীত জিহাদ করছি। কোন আলিম আজ পর্যন্ত বলেনি যে, "একজন ইমামের অধীনে পরিচালিত আল-জামাআর অনুপস্থিতিতে ফরজ জিহাদের হুকুম বাতিল হয়ে যায়। বরং আমরা দেখি যে, ক্রুসেড এবং তাতারীদের আগ্রাসনের সময় বিভিন্ন এলাকায় বিভিন্ন আমীরে অধীনে যুদ্ধ পরিচালিত হয়েছে। হালব (সিরিয়া) এর একজন আমীর ছিলেন, দামেস্কে ছিলেন একজন আমীর, মিশরে একাধিক আমির ছিল।

কোন একজন ব্যক্তি বলেননি যে, উক্ত বিশৃঙ্খল পরিস্থিতিতে জিহাদের হুকুম রহিত হয়ে যায় (মুসলিমদের ভূমি রক্ষার জন্য জিহাদ করা)। বরং জিহাদের দায়িত্ব আরও বেড়ে যায়। এই ঘটনা ঘটেছিল আন্দালুস-এ। কবি বলেছেন:

"তারা বিভিন্ন স্থানে দলে দলে বিভক্ত ছিল

"প্রত্যেক স্থানে ১ জন আমীর ছিল, যিনি ছিলেন দায়ী।"

অন্যজন লিখেছেন,
"যা আমাকে আন্দালুসিয়ার ব্যাপারে দুঃখিত করে,
তা হচ্ছে সেখানে রাজারা অনেক বড় বড় উপাধী ধারণ করেছে যার যোগ্য তারা নয়, ঠিক যেমন বিড়াল সিংহের মত গর্জন দিয়ে উঠে।"
কোন একজন আলিমও বলেননি যে, উক্ত অবস্থায় জিহাদ করা যাবে না, বরং আলিমরাই আন্দালুস-এর জিহাদে সামনের কাতারে ছিলেন।

ইমামের নিয়োগকৃত কমান্ডার যুদ্ধ সাময়িকভাবে বন্ধ করতে পারেন। যা ঘটেছিল মুতার দিবসে। খালিদ বিন আল ওয়ালীদ পতাকা উত্তোলন করলেন এবং তিনি রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-নিয়োগকৃত ছিলেন।
ইমাম অথবা আমীরুল মু'মিনীন এর অনুপস্থিতি দিফায়ী জিহাদ (মুসলিমদের ভূমি রক্ষার জিহাদ)-কে বন্ধ করে দেয়না। খিলাফাত প্রতিষ্ঠা হবে এই কথা বলে আমরা বসে থাকতে পারি না। খিলাফাত কখনো প্রতিষ্ঠা হবে না শুধুমাত্র কঠিন তত্ত্ব, অনেক জ্ঞান ও অধ্যায়ন দ্বারা। বরং জিহাদ-ই একমাত্র সঠিক পথ যার মাধ্যমে বিভক্ত নেতৃত্বকে একত্র করা যাবে, যাতে খিলাফাত প্রতিষ্ঠা হয়।

মুজাহিদরাই তাদের মধ্যে থেকে একজন আমীর নিযুক্ত করবে। এই আমীর'ই মুজাহিদদেরকে সংগঠিত করবে। তাদের চেষ্টাগুলোকে একত্র করবে এবং দূর্বলদেরকে সাহায্য করবে। একটি সহীস হাদীসে বর্ণিত হয়েছে যে,

عن عقبة بن عامر وكان من رهطه قال: بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم سرية فسلحت رجلا سيفا قال، فلما رجع قال: ما رأيت مثل ما لامنا رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: (أعجزتم إذ بعثت رجلا فلم يمض لأمري أن تجلعوا مكانه من يمضي لأمري.

অর্থ: "উকবা বিন আমির থেকে বর্ণিত (যিনি নিম্ন লিখিত দলের অর্ন্তভূক্ত ছিলেন) যে, "রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ১টি বাহিনীকে পাঠালেন এবং এর কমান্ডার নিযুক্ত করে দিলেন। যখন সে ফেরত আসল তখন বলল, তিনি "রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আমাদেরকে দোষারোপ করলেন যেরকম করতে আমি আগে দেখিনি। তিনি "রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বললেন "আমি যখন কোন ব্যক্তিকে প্রেরণ করি এবং সে আমার আদেশ পালন করতে অসমর্থ হয় তখন তাকে পরিবর্তন

করে এমন কাউকে নিয়োগ করতে পারলে না যে আমার আদেশ বাস্তবায়ন করতে পারে।”[৭৬]

যদিও রাসূল রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাঁর পবিত্র হাতে একজনকে যুদ্ধের পতাকা তুলে দিয়েছেন তারপরও তিনি তাকে পরিবর্তন করতে উৎসাহিত করেছেন। কিন্তু যদি শুরুতেই কোন আমির না থাকে তাহলে সেক্ষেত্রে আমীর নিয়োগ করা কতো গুরুত্বপূর্ণ? সবচেয়ে জটিল পরিস্থিতির সম্মুখীন হতে হয় যদি যুদ্ধের সময় আমির না থাকে। ইবনে কুদামা রহ. বলেছেন:

(فإن عدم الإمام لم يؤخر الجهاد لأن مصلحته تفوت بتأخيره).

অর্থ: “ইমামের অনুপস্থিতি জিহাদকে বন্ধ করে দেয় না কারণ জিহাদ বন্ধ হলে অনেক বড় ক্ষতি হবে।”[৭৭]

وإذا اختار الناس أميرا فيجب طاعته، جاء في فتح العلي المالك.

অর্থ: “যদি মুসলিমরা একজনকে আমীর নির্বাচিত করে তাকে অবশ্যই মানতে হবে।”[৭৮]

শাইখ মিয়ারা বলেছেন, “যদি কোন জায়গায় আমীর অনুপস্থিত থাকে এবং জনগণ একজনকে আমীর নির্বাচিত করে তাদের কাজগুলো সহজ করার জন্য দূর্বলকে শক্তিশালী করার জন্য এবং উক্ত আমীর যদি এগুলো অর্জনের জন্য জোর প্রচেষ্টা চালায়, সেক্ষেত্রে তার বিরুদ্ধে দাঁড়ানো যায়েজ নয়, যা দলীল থেকে প্রমাণিত। কেউ যদি বিশৃঙ্খলা সৃষ্টির জন্য, জামাআতকে বিভক্ত করার জন্য, ইসলামের অবাধ্যতার জন্য তার বিরুদ্ধতা করে তার ব্যাপারে রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর বাণী হচ্ছে,

إنها ستكون هنات وهنات فمن أراد أن يفرق أمر هذه الأمة وهو جميع فاقتلوه كائنا من كان من أتاكم وأمركم جميع على رجل واحد يريد تفريق جماعتكم فاقتلوه.

---

[৭৬] আবু দাউদ, আহমেদ, আল-হাকীম কর্তৃক সহীহ প্রমাণিত এবং আয্-যাহাবী এ ব্যাপারে একমত পোষণ করেছেন, ফাত্হ আর রাব্বানী।

[৭৭] আল-মুগনী-৮/২৫৩।

[৭৮] ফাত্হুল আলী আল-মালিক-১/৩৮৯।

অর্থ: "তখন যে ব্যক্তি বিভক্ত হতে চাবে, তাকে হত্যা কর সে যেই হোক না কেন এবং "যখন তোমরা এক ব্যক্তির অধীনে ঐক্যবদ্ধ হয়েছ তখন যদি কেউ জামাআত কে বিভক্ত করতে চায় তাকে হত্যা কর।"[৭৯]

৩য় প্রশ্ন: আমরা কী আফগানিস্তানে যুদ্ধ করতে পারি যেখানে বিভিন্ন আমীরের অধীনে যুদ্ধ হচ্ছে?

আফগানিস্তানে জিহাদ করা ফরজ যদিও সেখানে ভিন্ন ভিন্ন নেতার অধীনে জিহাদ পরিচালিত হচ্ছে। কারণ এখানে আগ্রাসী নাস্তিকদের বিরুদ্ধে মুসলিম ভূমি রক্ষার জন্য জিহাদ হচ্ছে। একাধিক মুসলিম দলগুলো কাফির ও নাস্তিকদের বিরুদ্ধে জিহাদ করছে। কারণ আমরা মনে করি প্রত্যেকটি দলের আমীর হচ্ছে উক্ত মুজাহিদ বাহিনীর একজন আমীর।

৪র্থ প্রশ্ন: সবাই যদি বসে থাকে তাহলে কেউ একা কি যুদ্ধ করতে পারে?

একজন একা হলেও যুদ্ধ করবে কারণ সর্ব শক্তিমান আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলা তার রাসূলকে বলেছেন,

فَقَاتِلْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ لا تُكَلَّفُ إِلا نَفْسَكَ وَحَرِّضِ الْمُؤْمِنِينَ عَسَى اللَّهُ أَنْ يَكُفَّ بَأْسَ الَّذِينَ كَفَرُوا وَاللَّهُ أَشَدُّ بَأْسًا وَأَشَدُّ تَنْكِيلًا.

অর্থ: "অতএব (হে নাবী), তুমি আল্লাহ্ তা'আলার পথে লড়াই করো, (কেননা) তোমাকে শুধু তোমার কাজকর্মের জন্যেই দায়ী করা হবে এবং তুমি মু'মিনদের (আল্লাহ্ তা'আলার পথে জিহাদ করতে) উদ্বুদ্ধ করতে থাকো... ।"[৮০]

এই আয়াতটিতে আল্লাহ তাঁর রাসূলকে দু'টি দায়িত্ব দিয়েছেন।

১। যুদ্ধ কর যদিও একাই করতে হয়।

২। মুমিনদের উদ্বুদ্ধ কর।

মাহিমান্বিত রব ক্বিতালের গুরুত্ব ব্যাখ্যা করেছেন। এই ক্বিতালের উদ্দেশ্য হচ্ছে কাফিরদের অপশক্তি দমন করা কারণ আমরা যদি ক্বিতাল না করি তারা আমাদের ভয় পাবে না। ক্বিতালকে উপেক্ষা করলে শিরক (সবচেয়ে বড় ফিতনা) ছড়িয়ে যায় এবং কুফর প্রতিষ্ঠিত হয়। সাহাবীগণ উক্ত আয়াতের অর্থ সাধারণভাবেই বুঝতে পেরেছিলেন।

---

[৭৯] সহীহ মুসলিম।

[৮০] সূরা নিসা, আয়াত ৮৪।

আবী ইসহাক (-ইব্‌বারিম বিন মুহাম্মদ বিন আল-ইশফারা) বলেছেন,[৮১] যখন কোন ব্যক্তি নিজেকে যুদ্ধের ময়দানে মুশরিকদের মধ্যে নিক্ষেপ করে তবে কি সে নিজেকে নিজের হাতে ধ্বংসের দিকে ঠেলে দেয়? তিনি বললেন 'না'। কারণ আল্লাহ তাঁর রাসূলকে (রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) পাঠিয়েছেন এবং বলেছেন,

فَقَاتِلْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ لا تُكَلَّفُ إِلا نَفْسَكَ وَحَرِّضِ الْمُؤْمِنِينَ عَسَى اللَّهُ أَنْ يَكُفَّ بَأْسَ الَّذِينَ كَفَرُوا وَاللَّهُ أَشَدُّ بَأْسًا وَأَشَدُّ تَنْكِيلًا.

অর্থ: "আল্লাহর পথে ক্বিতাল কর, (হে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) তুমি অন্য কারও ব্যাপারে জিজ্ঞাসিত হবে না।" তুমি যা উল্লেখ করলে তা হচ্ছে মাল খরচের ব্যাপারে।"[৮২]

ইবনুল আরাবী: এমন পরিস্থিতি আসতে পারে যখন প্রত্যেক ব্যক্তির জন্য জিহাদের উদ্দেশ্যে অগ্রসর হওয়া ফরজ। যে জিহাদকে বলা ফরজুল আইন। যখন শত্রুরা আমাদের কোন দেশকে আক্রমণ করে অথবা ঘেরাও দেয়। যদি তারা অগ্রসর না হয় তবে তারা গুনাহগার। যদি শত্রুরা মুসলিমদের বন্দি করে ফেলে, দেশ দখল করে তবে সেক্ষেত্রে সকলের উপর অগ্রসর হওয়া ফরজ। হালকা, ভারী, যানবাহনের চড়ে অথবা পায়ে হেঁটে, দাস অথবা স্বাধীন ব্যক্তি সকলকেই বের হতে হবে। যার পিতা বর্তমান আছে তার অনুমতি নিতে হবে না। যুদ্ধ চালিয়ে যেতে হবে যতক্ষণ পর্যন্ত আল্লাহর দ্বীন বিজয়ী না হয়, মুসলিম ভূমি রক্ষা না হয়, শত্রুদের লাঞ্ছিত না করা হয় এবং বন্দীদের মুক্ত করা না হয়। এ ব্যাপারে কোন ইখতিলাফ নেই।"[৮৩]

কিন্তু একজন কি করবে যদি সবাই বসে থাকে? সে বন্দী খুঁজবে এবং মুক্তিপণ পরিশোধ করবে। তার সামর্থ্য থাকলে নিজেই আক্রমণ করবে যদি তাও না পারে তবে একজন মুজাহিদ তৈরি করবে।[৮৪]

একা যুদ্ধ করা আল্লাহ পছন্দ করেন। রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন,

---

[৮১] আহমদ, আল-হাকীম বলেছেন সহীহ এবং আয্‌-যাহাবী সমর্থন করেছেন।

[৮২] এটা আসছে নিম্নের আয়াত হতে "আল্লাহ্‌র পথে খরচ কর এবং নিজের হাতে নিজেকে ধ্বংস করোনা।" অর্থাৎ আল্লাহ্‌র পথে (জিহাদ এবং অন্যান্য খাতে) ব্যয় না করা মানে হচ্ছে ধ্বংস। –আল ফাতহ আল রব্বানী (১৪/৮)

[৮৩] আহ্‌কাম আল-কুরআন-২/৯৫৪।

[৮৪] আহমদ এবং আবু দাউদ, হাসান।

عجب ربنا من رجل غزا في سبيل الله فانهزم أصحابه فعلم ما عليه فرجع حتى أهرق دمه فيقول الله عز وجل لملائكته: أنظروا إلى عبدي رجع رغبة فيما عندي وشفقة مما عندي حتى أهريق دمه.

অর্থ: "আমাদের রব এক ব্যক্তিকে দেখে অত্যন্ত খুশী হন যে আল্লাহর পথে আক্রমণ করে যদিও তার সাথীরা মার খেয়ে পালিয়ে যায় এবং সে জানে তার উপর কি বিপদ আসতে পারে তারপরও যুদ্ধ চালিয়ে যায় যতক্ষণ না তার রক্ত ঝরানো হয় এবং আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলা তাঁর ফিরিশতাদেরকে বলেন, "দেখ আমার বান্দা আমার কাছে যা আছে তা পাওয়ার আশায় এবং আমার কাছে যে শাস্তি আছে তার ভয়ে ফেরত এসেছে যতক্ষণ না তার রক্ত ঝরানো হয়।"[৮৫]

৫ম প্রশ্ন: আমরা কি ঐ সমস্ত মুসলিমদের সাথে একসাথে যুদ্ধ করতে পারি যাদের ইসলামী শিক্ষা অত্যন্ত কম?

এই প্রশ্ন করেছে নির্দিষ্ট কিছু ব্যক্তি যাদের মধ্যে কেউ কেউ আন্তরিক। আমরা ঐ সব আফগানীদের সঙ্গে মিলিত হয়ে কিভাবে যুদ্ধ করব যাদের মধ্যে সত্যবাদী লোক বিদ্যামান এবং খারপ লোকও বিদ্যমান; সেখানে ধুমপান ও নিসওয়ার (এক ধরনের টোবাকো) এর ছড়াছড়ি এবং যার জন্য একজন তার বন্দুক পর্যন্ত বিক্রি করে দেয়? যারা অন্ধভাবে হানাফী মাযহাব অনুসরণ করে এমন কি কেউ তাবীজও পরে।

শরীয়াহর হুকুম ব্যাখ্যা করার আগে বলতে চাই যে, আমাকে পৃথিবীর একটা এলাকা দেখান যেখানে মুসলিমদের কোনো সমস্যা নেই। এই সমস্যা থাকার কারণে আমরা কুফফারদের জন্য প্রত্যেক মুসলিম ভূমি ছেড়ে দিব?

উত্তর: আমরা অবশ্যই যুদ্ধ করবো। কারণ যুদ্ধ করতে হয় অনেক বড় ক্ষতি থেকে বাঁচার জন্য।

এই মূলনীতিটা উল্লেখ করা আছে 'মুজাল্লাতুল আহকামুল আদালিয়্যাতুল মা'দ্দা- কিতাবের-

২৬নং অধ্যায়: সকলের ক্ষতি থেকে বাঁচার জন্য ব্যক্তিগত ক্ষতি মেনে নেওয়া উচিত।

২৭নং অধ্যায়: অনেক বড় ক্ষতি শেষ হতে পারে ছোট স্বীকার এর মাধ্যেমে।

---

[৮৫] আহমদ এবং আবু দাউদ, হাসান।

২৮নং অধ্যায়: কেউ ২টি মুনকার এর যে কোন ১টি নিতে বাধ্য হয় তবে যেটি অপেক্ষাকৃত ছোট মুনকার তা গ্রহণ করবে।

২৯নং অধ্যায়: ২টি মুনকার এর মধ্যে অপেক্ষাকৃত কম মুনকারটি সর্বপ্রথম গ্রহণ করার নীতি।

আমাদের অবশ্যই ২টির যেকোন ১টি মুনকার নিতে হবে।

১। হয় রাশিয়া আফগানিস্তান দখল করবে, দারুল কুফর এ পরিণত হবে, কুরআন ও ইসলামকে নিষিদ্ধ করবে অথবা-

২। গুনাহগার জাতিকে সাথে নিয়ে জিহাদ করতে হবে?

ইবনে তাইমিয়্যাহ (রাহীমাহুল্লাহ) বলেছেন: "আহলুস সুন্নাহ ওয়াল জামাআর একটি মূলনীতি হচ্ছে, প্রত্যেক ভাল ও খারাপ মুসলিদের সাথে জিহাদে অংশগ্রহণ করা। যেমনঃ রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন, আল্লাহ এই দ্বীনকে খারাপ ব্যক্তি দ্বারা সাহায্য করবেন। যদি খারাপ আমীর অথবা পাপী সৈন্য ছাড়া জিহাদ পরিচালনা করা সম্ভব না হয় তখন তার জন্য যেকোন ১টি পথ খোলা আছে। হয় (১) তাদের থেকে দূরে থাকা এবং জিহাদের দায়িত্ব তাদের উপর ছেড়ে দেয়া, সেক্ষেত্রে শত্রুরা হয়ত বাকী মুসলিমদের উপরও নিয়ন্ত্রণ প্রতিষ্ঠা করে ফেলবে। যা তাদের দ্বীন ও জীবনের জন্য অনেক বড় ক্ষতি বয়ে আনবে। অথবা, (২) খারাপ আমীরের সাথে যুদ্ধে অংশগ্রহণ করা। এতে অপেক্ষাকৃত বড় ক্ষতি থেকে বাঁচা যাবে।

মুসলিমরা যদি সবগুলো আমল চালু করতে না পারে তাহলে কমপক্ষে যতটুকু সম্ভব আমল চালু করা উচিত। এই পরিস্থিতিতে অথবা এই রকম পরিস্থিতিতে এই রকম সিদ্ধান্ত নেয়া উচিৎ। হিদায়াতপ্রাপ্ত খলিফাগণ অনেক গাযওয়াতে এই রকম করেছেন রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেনঃ ঘোড়ার কপালে কিয়ামত পর্যন্ত কল্যাণ লেখা আছে প্রতিদান ও গাণীমাত হিসাবে। যতক্ষণ তারা মুসলিম থাকবে ততক্ষণ পর্যন্ত তাদের সাথে সথে একসাথে জিহাদ করা যাবে।

আফগানিস্তানের জিহাদ এর ভিত্তি হচ্ছে ইসলাম এবং এটার লক্ষ্য হচ্ছে পৃথিবীতে আল্লাহর দ্বীন প্রতিষ্ঠা করা। যদি ফিলিস্তিনে মুসলিমরা প্রথম থেকে যুদ্ধ করত, প্রাথমিক দিক থেকে মুসলিমদের খারাপ থাকা সত্ত্বেও জর্জ হাবাশ, নাইফ হাওয়াতামা, ফাদার কাপিচি এবং তাদের মত অন্যান্যরা আসার আগে -তবে মুসলিমরা ফিলিস্তিন হারাতো না। অথচ আফগান জিহাদের সমস্ত নেতারা সালাত

পড়ে, রোযা রাখে এবং অন্যান্য ইবাদত করে এবং মানুষদেরকে ইসলামের দিকে দাওয়াত দেয়।

যতক্ষণ পর্যন্ত একজন মুসলিম থাকে ততক্ষণ পর্যন্ত তাদের সাথে থেকে যুদ্ধ করা ফরজ। তাদের আমলের অবস্থা কি রকম তা বিবেচ্য বিষয় নয় যতক্ষণ পর্যন্ত তারা কাফিরদেরকে এবং আহলে কিতাবদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করে।

আশ-শাওকানী বলেছেন, “খারাপ এবং গুনাহগার মুসলিমদের নিকট সাহায্য চাওয়া জায়েজ। এই ব্যাপারে সকলে একমত পোষণ করেছেন।”[৮৬]

৬ষ্ঠ প্রশ্ন: দূর্বল অবস্থায় কি আমরা মুশরিকদের নিকট থেকে সাহায্য চাইতে পারি?

কিছু মানুষ বিশ্বাস করে আফগানিস্তানের জিহাদের জন্য আমেরিকা ও পশ্চিমা বিশ্বের কাছ থেকে সাহায্য আসে আর ফিলিস্তিনের জিহাদের জন্য রাশিয়ার কাছ থেকে সাহায্য আসে। এই ধরণের সাহায্য নেওয়া হারাম। এই ব্যাপারে ফুকাহাদের ইজমা হয়েছে এবং এটি জিহাদের উদ্দেশ্যেকে ধ্বংস করে দেয়। এই ব্যাপারে অনেক হাদীসই সুস্পষ্টভাবে প্রমাণ করে যে কুফফারদের কাছ থেকে সাহায্য চাওয়া নিষেধ। রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বদরের যুদ্ধে একজন মুশরিককে বলেছিলেন,

فارجع فلن أستعين بمشرك

অর্থ: “চলে যাও, আমি কোন মুশরিকের সাহায্য নিব না।”[৮৭]

অন্য হাদীসে একইভাবে ইরশাদ হয়েছে,

إنا لا نستعين بالمشركين على المشركين

অর্থ: “আমরা মুশরিকদের বিরুদ্ধে মুশরকিদের সাহায্য নিই না।[৮৮]

হাইসামী “মাজমুয়া আল জাওয়াইদ” কিতাবে বলেছেন আহমদ ও তাবারানী এর বর্ণনাকারীগণ বিশ্বস্ত এবং আরেকটি সহীহ বর্ণনা থেকে আসছে যে, “সাফওয়ান বিন উমাইয়্যা কাফির থাকা অবস্থায় রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর সাথে মিলিত হয়ে যুদ্ধ করেছিলো।”

ইমাম নববী রহ. বলেছেন,

صفوان بن أمية شهد حنينا مع النبي صلى الله عليه وسلم كافرا.

---

[৮৬] নাইল আল-আউতার-৮/১২৮।
[৮৭] সহীহ মুসলিম, নাইল আল-আউতার-৭/১২৮।
[৮৮] আহমদ এবং আত-তাবারানী।

অর্থ: "সাফওয়ান বিন উমাইয়্যা কে হুনাইনে রসূল সাল্লাল্লাহু আ'লাইহি ওয়া স্যাল্লাম-এর সাথে দেখা গেছে, অথচ তখন সে কাফির ছিল।"
রাসূল সাল্লাল্লাহু আ'লাইহি ওয়া সাল্লাম হুনাইনের দিন সাফওয়ান বিন উমাইয়্যার নিকট থেকে বর্ম ধার নিয়েছিলেন। তিনি সাল্লাল্লাহু আ'লাইহি ওয়া সাল্লাম তখন তাকে বলেছিলেন, "এই ধার তোমাকে ফেরত দিব।"[৮৯]

সীরাত রচয়িতাদের কাছে এই বর্ণনাটি খুবই প্রসিদ্ধ যে, ক্বাসমান রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর সাথে উহুদের অভিযান করেছিল এবং কাফিরদের তিনজন পতাকাবাহীদের হত্যা করেছিল। রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছিলেন,

إن الله ليأزر هذا الدين بالرجل الفاجر.

অর্থ: "আল্লাহ এই দ্বীনকে কোন খারাপ ব্যক্তি দ্বারাও সাহায্য করেন।"[৯০]
অনুরুপভাবে বিরপীতধর্মী হাদীস থাকায় আলিমরা এই বিষয়ে মতপার্থক্য করেছেন। মুশরিকদের কাছে সাহায্য চাওয়া প্রাথমিক ভাবে হারাম ছিল কিন্তু পরে তা রহিত হয়ে যায়। আল্লামা হাফিয রহ. তালখীস এ বলেছেন, "এটাই হচ্ছে উত্তম সামঞ্জস্য এবং আশ-শাফিঈ রা. ইহা একমত পোষণ করেছেন।"[৯১]

ফিক্বহ এর বড় চারজন ইমাম একমত পোষণ করেছেন যে, কাফিরদের নিকট থেকে সাহায্য চাওয়া কিছু শর্তের ভিত্তিতে জায়েজ।
১। ইসলাম এর শাসন অবশ্যই মুশরিকদের চাইতে উপরে থাকতে হবে। অর্থাৎ ইসলামের শক্তি মুশরিকদের মিলিত শক্তির চাইতে বেশি থাকতে হবে যাদের কাছ থেকে সাহায্য চাওয়া হচ্ছে এবং সেটা হচ্ছে যখন কুফ্ফাররা মুসলিমদের বিরুদ্ধে একত্রে যুদ্ধ করছে।
২। কুফ্ফারদের অবশ্যই মুসলিমদের সর্ম্পকে ভাল ধারণা থাকতে হবে এবং মুসলিমদের অবশ্যই তদের বিশ্বাসঘাতকতা সর্ম্পকে নিরাপদ থাকতে হবে এবং এটা তাদের ব্যবহার দেখে বুঝা যাবে।

৩। মুসলিমদের যদি সাহায্য অত্যাবশ্যকীয় হয় অথবা কুফ্ফাররা সাহায্যের কথা নিজ থেকে বলে।

---

[৮৯] তাহ্‌তীব আল-আশমা ওয়াল-লুঘাত-২৬৩।
[৯০] আল-বুখারী, আবু হুরাইরা কতৃক বর্ণিত।
[৯১] নাইল আল-আউতার-৮/৪৪।

অমুসলিমদের সাহায্য নেয়ার ব্যাপারে বিভিন্ন মাযহাবের রায়:

হানাফি রায়:

لا بأس بأن يستعين المسلمون بأهل الشرك على أهل الشرك إذا كان حكم الإسلام هو الغالب.

মুহাম্মাদ বিন হাসান আশ শায়বানী রহ. বলেছেন, "এটা গ্রহণযোগ্য যে, কোন মুসলিম, মুশরিকদের নিকট থেকে সাহায্য গ্রহণ করবে কিন্তু শর্ত হলো এমতাবস্থায় ইসলামের শক্তি অবশ্যই বেশি থাকতে হবে।"[৯২]

জাসসাস রহ. বলেছেন,

قال أصحابنا: لا بأس بالإستعانة بالمشركين على قتال غيرهم من المشركين إذا كانوا متى ظهروا كان حكم الإسلام هو الظاهر.

অর্থ: "আমাদের বয়োজেষ্ঠ উলামাগণ বলেছেন, "যুদ্ধের ক্ষেত্রে মুশরিকদের বিরুদ্ধে মুশরিকদের সাহায্য নেয়া জায়েজ যখন এই সাহায্যের কারণে ইসলামের বিজয় হয়।"[৯৩]

মালিকী রায়:

ইবনুল কাসিম আল মালিক (রাহীমাহুল্লাহ) বলেছেন,

ولا أرى أن يستعينوا بهم يقاتلون معهم إلا أن يكون نواتيه أو خدما، فلا أرى بذلك بأسا.

বিশেষ **ক্ষেত্রে মুশরিকদের সাহায্য** নেয়াতে আমি দোষ মনে করি না- যতক্ষণ না তারা (মুশরিকরা) **দাসের ভূমিকা** পালন করে সাহায্য করে -(তারা নত হয়ে সাহায্য করলে) **এমতাবস্থায় কোন অসুবিধা** নেই তাদের সাহায্য নেয়ার ব্যাপারে।"[৯৪]

ইমাম মালিক রহ. বলেন,

لا أرى أن يستعان بالمشركين على المشركين إلا أن يكونوا خدما.

---

[৯২] শারহ্ কিতাব আশ-সিয়ার ফুকারা-২০১।
[৯৩] আহ্কামুল -জাস্‌সাস কর্তৃক।
[৯৪] আল-মাদুনা-২/৪০।

আমার মতে এটি দোষণীয় নয় যে, মুশরিকদের বিরুদ্ধে সাহায্য নেওয়া যাবে যতক্ষণ না তারা দাসের ভূমিকায় সাহায্য করে।"[৯৫]

শাফেঈ রায়:

আর রামলী রহ. বলেছেন,

وللإمام أو نائبه الإستعانة بكفار ولو أهل حرب كأن يعرف حسن رأيهم فينا، ويشترط لجواز الإستعانة احتياجنا له لنحو خدمة أو قتال لقلتنا.

অর্থ: "ইমাম অথবা নায়েবে ইমাম কুফ্ফারদের কাছ থেকে সাহায্য চাইতে পারে, যদিও তারা অহলুল হারব হয়। যদি তিনি জানেন যে কাফিররা আমাদের সম্পর্কে ভাল ধারণা রাখে এবং শর্ত হচ্ছে তাদের সাহায্য আমাদের দরকার যুদ্ধের জন্য কারণ আমাদের সংখ্যা কম।"

হাম্বলী রায়:

ইবনে কুদামা রহ. বলেছেন,

وعن أحمد ما يدل على جواز الإستعانة بالمشرك، بل روي عن أحمد أنه يسهم للكافر من الغنائم إذا غزا مع الإمام خلافا للجمهور الذين لا يسهمون له.

অর্থ: "ইমাম আহমাদ এর মত হচ্ছে, মুশরিকদের থেকে সাহায্য চাওয়া জায়েজ এবং তারা গণীমার অংশ পাবে যদি তারা ইমামের অধীনে যুদ্ধ করে। তিনি অধিকাংশের মতের বাইরে গিয়েছেন যারা গণীমাতের অংশ দেয়ার ব্যাপারটি সমর্থন করেন নি।"

---

[৯৫] আল-কুরতুবী-৮/১০০।

জিহাদের পক্ষে নাযিলকৃত আদেশ সংশ্লিষ্ট দলীলসমূহ

জিহাদ ও শান্তি চুক্তির অনুমোদনের ব্যাপারে অনেক লেখক কুরআনের আয়াত নাযিলের ধারাবাহিকতা না মেনে ভুল করেছেন। তারা বিক্ষিপ্তভাবে আয়াত উল্লেখ করছেন। অথচ এক্ষেত্রে আবশ্য কর্তব্য হলো জিহাদের ব্যাপারে আয়াত নাযিলের ধারাবাহিকতা জানা এবং সে অনুযায়ী আমল করা। এ বিষয়ে অবতীর্ণ চূড়ান্ত আদেশের ধারাবাহিকতা নিম্নরূপ:

وَقَاتِلُوا الْمُشْرِكِينَ كَافَّةً كَمَا يُقَاتِلُونَكُمْ كَافَّةً وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ مَعَ الْمُتَّقِينَ.

অর্থ: "আর তোমরা সকলে মুশরিকদের সাথে লড়াই করো যেমনিভাবে তারা সকলে তোমাদের সাথে লড়াই করে, আর জেনে রাখ, নিশ্চয়ই আল্লাহ মুত্তাকীদের সাথে আছেন।"[৯৬]

অন্যত্র ইরশাদ হয়েছে,

فَاقْتُلُوا الْمُشْرِكِينَ حَيْثُ وَجَدْتُمُوهُمْ وَخُذُوهُمْ وَاحْصُرُوهُمْ وَاقْعُدُوا لَهُمْ كُلَّ مَرْصَدٍ فَإِنْ تَابُوا وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَآتَوُا الزَّكَاةَ فَخَلُّوا سَبِيلَهُمْ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ.

অর্থ: "তোমরা মুশরিকদেরকে হত্যা করো তাদেরকে যেখানেই পাও এবং তাদেরকে পাকড়াও কর, তাদেরকে অবরোধ করো এবং তাদের জন্য প্রতিটি ঘাঁটিতে ওঁৎ পেতে বসে থাকো। তবে যদি তারা তাওবা করে এবং সালাত কায়েম করে, আর যাকাত দেয়, তাহলে তাদের ছেড়ে দাও। নিশ্চয়ই আল্লাহ বড়ই ক্ষমাশীল, পরম দয়ালু।"[৯৭]

ইমাম ইবনুল কাইয়্যিম রহ. যাদুল মায়াদ গ্রন্থে এর ব্যাখ্যা করেছেন এভাবে যে,

أن الجهاد كان محرما في مكة المكرمة، ثم ماذونا فيه عند الهجرة، ثم مامورا به مع من بادأهم بالقتال، ثم مامورا مع المشركين كافة.

অর্থ: "মক্কায় থাকা অবস্থায় জিহাদকে বৈধতা দেয়া হয়নি। সর্ব প্রথম জিহাদের অনুমতি দেয়া হয় হিজরতের পর, পরবর্তীতে আদেশ করা হয় শুধু তাদের বিরুদ্ধে যারা মুসলিমদের আক্রমণ করে এবং পরিশেষে মুশরিকদের বিরুদ্ধে ব্যাপকভাবে যুদ্ধের আদেশ দেয়া হয়।"[৯৮]

---

[৯৬] সূরা তাওবা, আয়াত ৩৬।
[৯৭] সূরা তাওবা, আয়াত ৫।
[৯৮] যাদুল মায়াদ।

ইমাম ইবনু আবিদিন (ইবনুল-কাইয়্যুম, আবু আব্দুল্লাহ আল-জাওজিয়া) রহ. বলেছেন, জেনে রাখো! জিহাদের আদেশ নাযিল হয়েছে ধারাবিহকভাবে। রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে প্রথম আদেশ দেয়া হয়েছিল তাবলীগ করার জন্য ও মুশরিকদের থেকে মুখ ফিরিয়ে নেয়ার জন্য।"[৯৯]

মহিমান্বিত আল্লাহ বলেছেন,

فَاصْدَعْ بِمَا تُؤْمَرُ وَأَعْرِضْ عَنِ الْمُشْرِكِينَ.

অর্থ: "অতএব তোমাকে যে আদেশ দেয়া হয়েছে তুমি খোলাখুলি জনসম্মুক্ষে তা বলে দাও এবং (এরপরও) যারা (আল্লাহ্‌র সাথে) শরীক করে তাদের তুমি উপেক্ষা করো।"[১০০]

এর পরবর্তী পর্যায়ে কাফিরদেরকে বিজ্ঞতার সাথে দাওয়ার দেওয়ার জন্য নির্দেশ দেয়া হয়। নির্দেশনা আসে-

ادْعُ إِلَى سَبِيلِ رَبِّكَ بِالْحِكْمَةِ وَالْمَوْعِظَةِ الْحَسَنَةِ وَجَادِلْهُمْ بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ إِنَّ رَبَّكَ هُوَ أَعْلَمُ بِمَنْ ضَلَّ عَنْ سَبِيلِهِ وَهُوَ أَعْلَمُ بِالْمُهْتَدِينَ.

অর্থ: "তুমি মানুষকে তোমার রবের পথে আহবান কর হিকমাত ও সদুপদেশ দ্বারা এবং উহাদের সহিত তর্ক করিবে উত্তম পন্থায়। তোমার রব, তাঁহার পথ ছাড়িয়া কে বিপথগামী হয় সে সম্বন্ধে সবিশেষ অবহিত এবং কাহারা সৎপথে আছে তাহাও তিনি সবিশেষ অবহিত।"[১০১]

এরও পরবর্তীতে অবস্থার প্রয়োজনে দেয়া হয় যুদ্ধের অনুমতি-

أُذِنَ لِلَّذِينَ يُقَاتَلُونَ بِأَنَّهُمْ ظُلِمُوا وَإِنَّ اللَّهَ عَلَى نَصْرِهِمْ لَقَدِيرٌ.

অর্থ: "যুদ্ধের অনুমতি দেওয়া হইল তাহাদিগকে যাহারা আক্রান্ত হইয়াছে; কারণ তাহাদের প্রতি অত্যাচার করা হইয়াছে। আল্লাহ্ নিশ্চয়ই তাহাদিগকে সাহায্য করিতে সম্যক সক্ষম।"[১০২]

এরপর কাফিররা প্রথম আক্রমণ করলে তাদের বিরুদ্ধে আক্রমণের আদেশ দেয়া হয়েছে। ইরশাদ হয়েছে,

---

[৯৯] হাশিয়াতু ইবনু আবিদীন-৩/২৩৯।
[১০০] সূরা হিজর, আয়াত ৯৪।
[১০১] সূরা নাহল, আয়াত ১২৫।
[১০২] সূরা হজ্জ, আয়াত ৩৯।

فَإِنْ قَاتَلُوكُمْ فَاقْتُلُوهُمْ كَذَٰلِكَ جَزَاءُ الْكَافِرِينَ.

অর্থ: "তারা যদি তোমাদের বিরুদ্ধে লড়াই করে, তবে তোমরাও তাদেরকে হত্যা করো। এটাই কাফিরদের প্রতিদান।"[১০৩]

এরপর যুদ্ধের নির্দেশ দেয়া হয় শর্ত সাপেক্ষে, নিষিদ্ধ মাসগুলো অতিক্রম করার পর। ইরশাদ হয়েছে,

فَإِذَا انسَلَخَ الْأَشْهُرُ الْحُرُمُ فَاقْتُلُوا الْمُشْرِكِينَ حَيْثُ وَجَدتُّمُوهُمْ وَخُذُوهُمْ وَاحْصُرُوهُمْ وَاقْعُدُوا لَهُمْ كُلَّ مَرْصَدٍ فَإِنْ تَابُوا وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَآتَوُا الزَّكَاةَ فَخَلُّوا سَبِيلَهُمْ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ.

অর্থ: "অতপর যখন নিষিদ্ধ মাসসমূহ অতিবাহিত হয়ে যায় তখন তোমরা মুশরিকদেরকে হত্যা করো তাদেরকে যেখানেই পাও এবং তাদেরকে পাকড়াও করো, তাদেরকে অবরোধ করো এবং তাদের জন্য প্রতিটি ঘাঁটিতে ওঁৎ পেতে বসে থাকো। তবে যদি তারা তাওবা করে এবং সালাত কায়েম করে, আর যাকাত দেয়, তাহলে তাদের ছেড়ে দাও। নিশ্চয়ই আল্লাহ বড়ই ক্ষমাশীল, পরম দয়ালু।"[১০৪]

এরপর সাধারণভাবে সকল কাফিরদের বিরুদ্ধে ব্যাপকভাবে যুদ্ধের নির্দেশ দিয়ে ঘোষণা করা হয়েছে,

وَقَاتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ الَّذِينَ يُقَاتِلُونَكُمْ وَلَا تَعْتَدُوا إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْمُعْتَدِينَ.

অর্থ: "যারা তোমাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করে তোমরাও আল্লাহ্‌র পথে তাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করো; কিন্তু সীমালংঘন করিও না। নিশ্চয়ই মহান আল্লাহ সীমালংঘনকারীদেরকে ভালোবাসেন না।"[১০৫]

এজন্যই আয়াত নাযিলের ধারাবাহিকতার সঠিক জ্ঞানও অর্জন করা জরুরী। **একটি বিষয় পরিস্কার থাকা উচিৎ যে, দাওয়ার প্রাথমিক স্তরের দিকে রাজনৈতিক সমঝোতায় যাওয়া জায়েজ নয় যতক্ষণ পর্যন্ত না একটি শক্তিশালী নেতৃত্বের অধীনে এই দাওয়াহ প্রতিষ্ঠিত হয় এবং এটার লক্ষ্যকে সংরক্ষণ করা যায়।**

---

[১০৩] সূরা বাকারা, আয়াত ১৯১।
[১০৪] সূরা তাওবা, আয়াত ৫।
[১০৫] সূরা বাকারা, আয়াত ১৯০।

দি ইসলামিক দাওয়া প্রাথমিক পর্যায়েই কাফিরদের সাথে সমঝোতায় compromise) রাজী হয় তবে দাওয়ার বিষয়বস্তুকে বিসর্জন compromise) দিতে হয় পরিস্থিতি ঘোলাটে হয়ে যায় এবং মানুষের মধ্যে ুল বুঝাবুঝির সৃষ্টি হয়। দাওয়ার প্রাথমিক ধাপের জন্য উদাহরণ হচ্ছে ঐতিহাসিক সূরা সূরায়ে কাফিরুন। যাতে ইরশাদ হয়েছে,

قُلْ يَا أَيُّهَا الْكَافِرُونَ. لا أَعْبُدُ مَا تَعْبُدُونَ. وَلا أَنْتُمْ عَابِدُونَ مَا أَعْبُدُ. وَلا أَنَا عَابِدٌ مَا عَبَدْتُمْ. وَلا أَنْتُمْ عَابِدُونَ مَا أَعْبُدُ. لَكُمْ دِينُكُمْ وَلِيَ دِينِ.

অর্থ: "হে নবী আপনি বলুন! হে কাফিররা! (আল্লাহ, তাঁর রসূল, একত্ববাদে, ফেরিশতা, কিতাব, কিয়ামাত, ক্বাদর এর সাথে কুফরীকারী) আমি তার ইবাদাত করিনা যার ইবাদাত তোমরা করো। আর তোমরাও তাঁর ইবাদত করো না আমি যাঁর ইবাদাত করি। আর তোমরা যার ইবাদত করছ আমি তার ইবাদাতকারী হব না। আর আমি যার ইবাদাত করি তোমরা তার ইবাদাতকারী হবে না। তোমাদের জন্য তোমাদের দীন আর আমার জন্য আমার দীন।"[১০৬]

প্রাথমিক পর্যায়ে ঈমানদারদের আরেকটি নমুনা হচ্ছে,

أَلَهُمْ أَرْجُلٌ يَمْشُونَ بِهَا أَمْ لَهُمْ أَيْدٍ يَبْطِشُونَ بِهَا أَمْ لَهُمْ أَعْيُنٌ يُبْصِرُونَ بِهَا أَمْ لَهُمْ آذَانٌ يَسْمَعُونَ بِهَا قُلِ ادْعُوا شُرَكَاءَكُمْ ثُمَّ كِيدُونِ فَلا تُنْظِرُونِ. إِنَّ وَلِيِّيَ اللَّهُ الَّذِي نَزَّلَ الْكِتَابَ وَهُوَ يَتَوَلَّى الصَّالِحِينَ.

অর্থ: "(হে মুশরিকরা আল্লাহ ব্যতীত তোমরা যাদেরকে ডাকো) তাদের কি পা আছে যার সাহায্যে তারা চলে? বা তাদের কি হাত আছে যা দ্বারা তারা ধরে? বা তাদের কি চক্ষু আছে যার মাধ্যমে তারা দেখে? অথবা তাদের কি কান আছে যা দ্বারা তারা শুনে? বল, 'তোমরা তোমাদের শরীকদের ডাক। তারপর আমার বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্র কর এবং আমাকে অবকাশ দিয়ো না। নিশ্চয়ই আমার অভিভাবক আল্লাহ, যিনি কিতাব নাযিল করেছেন। আর তিনি নেককারদের দেখাশোনা করেন।"[১০৭]

আমাদের অবশ্যই দাওয়া করতে হবে এবং তা কাফিরদের পর্যন্ত পৌছাতে হবে। দায়ীদেরকে অবশ্যই উঁচু গলায় বলতে হবে যতক্ষণ না তাদেরকে পরীক্ষা করা হয় যাতে তাদের আত্মা সবর অনুযায়ী পরীক্ষিত হতে পারে। এটা

---

[১০৬] সূরা কাফিরুন, আয়াত ১-৬।

[১০৭] সূরা আ'রাফ, আয়াত ১৯৫-১৯৬।

হয়েছিল রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ও তাঁর সাহাবাদের সাথে মক্কায়। কিন্তু যখন ইসলামী রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠিত হয়ে যায় তখন কেউ আর (কাফিরদের সাথে) চুক্তি করতে বাঁধা দিতে পারবো না।

কাফিরদের সাথে শান্তি চুক্তি করার শর্তসমূহ:

ফুকাহাগণের মধ্যে এই ব্যাপারে ইখতিলাফ আছে যে, কাফিরদের সাথে শান্তি চুক্তি করা যাবে কিনা। কেউ হুদায়বিয়ার ঘটনা উল্লেখ করে বলেন শান্তিচুক্তি অনুমোদিত। আবার কেউ বলেন এটি অনুমোদিত যদি মুসলিমরা চরম দুর্বল অবস্থায় থাকে। আবার কেউ বলেন এটি জিহাদের আয়াত নাযিল হওয়ার পর এখন অবৈধ। আমরা বলি, শান্তিচুক্তি বৈধ যদি এর ফলে মুসলিমদের কল্যাণ হয়। কিন্তু শর্ত হচ্ছে যে, চুক্তিতে এম কোন ধারা থাকতে পারবে না যাতে দ্বীনের কোন ক্ষতি হয়। যেমন-

১। চুক্তিতে এমন কোন ধারা থাকতে পারবে না যাতে মুসলিমদের এক বিঘত ভূমিও বেদখল হয়ে যায়। কারণ ইসলামের ভূমি কারও ব্যক্তিগত সম্পদ নয়। এই ধরণের ধারা চুক্তিতে অবৈধ করে দেয়ার কারণ ভূমি হচ্ছে ইসলাম ও আল্লাহর। মুসলিমদের অঞ্চলের কোন কিছুর অপব্যবহার জায়েজ নয়। অথবা বনী আদমকে বিনিময় হিসেবে ব্যবহার করাও বৈধ নয় যার মালিক একমাত্র আল্লাহ। রাশিয়ানদের সাথে ততক্ষণ পর্যন্ত চুক্তি করা জায়েজ নয় যতক্ষণ না তারা আফগানিস্তানের কোন অংশ দখল করে রাখে। তদ্রুপ ইহুদীদের সাথে চুক্তি করা জায়েজ নয় ফিলিস্তিনে।

২। যদি জিহাদ ফরজুল আইন হয় তবে তা শান্তিচুক্তি বাতিল করে দেয়। যেমন: শত্রুরা যদি মুসলিম ভূমি আক্রমণ করে অথবা আক্রমণের ইচ্ছা করে। "খলীফা যদি খ্রীষ্টানদের সাথে শান্তিচুক্তি স্থাপন করে কিন্তু মুসলিমরা যদি অনুভব করে জিহাদই একমাত্র সমাধান তখন শান্তিচুক্তি বাতিল হবে এবং খলীফার কাজটি বর্জনীয় (চুক্তির ব্যাপারে শুধুমাত্র)।"[১০৮]
যখন জিহাদ ফরজুল আইন হয় তখন শান্তিচুক্তি করা জায়েজ নয় যেমন: শত্রুরা যখন মুসলিম দেশ দখল করে।

---

[১০৮] ফাতহুল আলী, ১/২৮৯।

আমরা যা কিছু বর্ণনা করেছি তার মধ্যে যে বিষয়গুলোর কারণে জিহাদ ফরজুল আইন হয় সেগুলোর কারণে শান্তিচুক্তি বাতিল হয়ে যাবে। কারণ যেখানে সমস্যার সমাধান হচ্ছে জিহাদ সেখানে এই চুক্তির কারণে ফরজুল আইন পালন করা যাবে না।

কাজী (কাজী/বিচারক) ইবনুর রুশদ বলেছেন, "আলিমগণ একমত পোষণ করেছেন যে, যখন জিহাদ ফরজুল আইন হয়ে যায় তখন এটি ফরজ হজ্জের চাইতেও অগ্রাধিকার পায়। কারণ যদি জিহাদ ফরজুল আইন হয়ে যায় তখন যত তারাতারি সম্ভব হবে পালন করতে হবে কিন্তু ফরজ হজ্জ কিছু দেরিতে পালন করা যেতে পারে। সুতরাং এই চুক্তি বর্জন করতে হবে কারণ এটা শরীয়াহ সম্পর্কিত নয়। এটি গ্রহণযোগ্য নয় যে এবং এর শর্তাবলী মানা বাধ্যতামূলক নয়। যাদেরই শরীয়ার মূলনীতি সম্পর্কে সঠিক বুঝ আছে তারা এই মতই পোষণ করেছেন। আর উক্ত চুক্তির কারণে ফরজ জিহাদ বন্ধ হয়ে যায়। এটা বন্ধ করা অবৈধ এবং প্রত্যেক অবৈধ মানা বাধ্যতামূলক নয়।

৩। যেকোন শর্ত আল্লাহর শরীয়াকে বর্জন করলে অথবা ইসলামের কোন অংশকে উপেক্ষা করলে উক্ত শর্ত চুক্তিকে বাতিল করে। রাশিয়ার জন্য চুক্তি করা (আফগানিস্তানের সাথে) ঠিক নয় কারণ এটি জিহাদ এবং এর লক্ষ্যকে বাতিল করে দেয়।

৪। যদি চুক্তিতে এমন কোন শর্ত থাকে যার কারণে মুসলিরা অপমানিত হয় অথবা এই রকম পরিবেশ তৈরি হয় তবে এই রকম চুক্তি করা যাবে না। যেমনটি ইমাম যুহরী রহ. একটি হাদীসে উল্লেখ করে বলেছেন, যখন মুসলিমদের উপর চাপ বড় আকার ধারণ করল, তখন রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম একজনকে উয়াইনা ইবন হুসন বিন হানিফা বিন বাদর এবং হারিছ বিন আবি আউফ আল মুযনী -তারা বনী গাতফান এর প্রধান ছিল- এর কাছে পাঠালেন। রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাদেরকে মদীনার এক তৃতীয়াংশ ফসলের প্রস্তাব দিলেন এই শর্তে যে, তারা রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এবং তাঁর সাহাবীগণের কাছ থেকে নিজেদের সমস্ত বাহিনী নিয়ে চলে যাবে। তারা এ নিয়ে আলাপ-আলোচনা করছিল কিন্তু তা চূড়ান্ত হয়নি। যখন রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম সিদ্ধান্ত চূড়ান্ত করতে যাবেন, তখন তিনি সা'দ বিন মুয়ায ও সা'দ বিন উবাদা রা. কে

পাঠানোর চিন্তা করলেন। তিনি তাদেরকে পরিস্থিতির ব্যাখ্যা দিয়ে বললেন, "তোমরা ভাল করে জানো, আরবরা আমাদের উপর সম্মিলিতভাবে আক্রমন চালাচ্ছে। তোমাদের কি অভিমত, যদি যদি আমরা তাদেরকে মদীনার কিছু ফসল দেই?

তারা বলল, হে আল্লাহর রাসূল! সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম যদি আপনি বলেন তবে আপনার কথাই শীরধার্য্য। তাহলে আমরা আপনার মতেরই অনুসরণ করবো। তবে আমরা ইতিপূর্বে তাদের কাছে বিক্রয় করা অথবা তাদেরকে সামান্য মেহমানদারী ব্যতীত তাদেরকে একটি খেজুরও দিতাম না - এবং এটি ছিল আমাদের মুশরিক থাকা অবস্থায়। কিন্তু আল্লাহ তাআলা আমাদেরকে ইসলামের মাধ্যেমে সম্মানিত করেছেন। রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাদের কথা শুনে খুশি হলেন। আনসাররা অনুভব করছিল যে, তারা এতে অপমানিত হবে। অন্য আরেকটি বর্ণনায় এসেছে, আনসাররা উত্তর দিল, "আমরা তোমাদের তরবারি ছাড়া কিছুই দিব না। [১০৯]

৫। শরীয়া বিরোধী কোন চুক্তি করা যাবে না। উদাহরণ স্বরুপ-

ক) এমন চুক্তি যার কারণে কাফিরদেরকে দু'টি পবিত্র মসজিদের (সমগ্র আবর ভূমি) ভূমিতে বসবাসের অনুমতি দেয়া হয়। কারণ সহীহ হাদীসে এসেছে, রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন,

أخرجوا اليهود والنصارى من جزيرة العرب

অথ: "তোমরা ইহুদী এবং নাসারাদেরকে জাজিরাতুল আরব (সমগ্র আরব ভূমি) থেকে বের করে দাও।"[১১০]

খ) মুসলিম মহিলাদেরকে কাফিরদের নিকট ফেরত পাঠানো যাবে না। এ ব্যাপারে কুরআনে ইরশাদ হয়েছে,

فَإِنْ عَلِمْتُمُوهُنَّ مُؤْمِنَاتٍ فَلا تَرْجِعُوهُنَّ إِلَى الْكُفَّارِ لا هُنَّ حِلٌّ لَهُمْ وَلا هُمْ يَحِلُّونَ لَهُنَّ.

অর্থ: "...যদি তারা সত্যিকার ঈমানদার হয় তবে তাদেরকে কাফিরদের নিকট ফেরত পাঠাবেনা, তারা কাফিরদের জন্য হালাল নয় (স্ত্রী হিসেবে) এবং কাফিররাও তাদের জন্য হালাল নয় (স্বামী হিসেবে)...।"[১১১]

---

[১০৯] ই'লাউস-সুনান- ১২/৮।

[১১০] সহীহ মুসলিমে বর্ণিত, আল-ফাত্হ আল রাব্বানী-১৪/১২০।

বে মুসলিম পুরুষদেরকে কাফিরদের কাছে ফেরত পাঠানোর ব্যাপারে কাহাগণের মধ্যে মতপার্থক্য আছে। কিছু আলিম হুদায়বিয়ার সন্ধির উদাহরণ ল্লেখ করে বলেন যে এটা জায়েজ কিন্তু বাকী অধিকাংশ আলেমগণ বলেন যে দায়বিয়ার সন্ধির ঘটনায় মুসলিমদেরকে কাফিরদের নিকট ফেরত পাঠানোর নুমতি ছিল রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর জন্য বিশেষভাবে নর্দিষ্ট (খাস)। কারণ তিনি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম জানতেন যে, আল্লাহ ঐ মুসলিমদের জন্য একটি পথ বের করে দিবেন। -এটাই অধিকাংশের মত। হযরত বারা ইবনু আজিব রা. বলেছেনঃ "রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম হুদায়বিয়ার দিনে কাফিরদের সাথে নিম্নের চুক্তিতে আবদ্ধ হয়েছিলেন,

১। রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর নিকট থেকে যে ব্যক্তি কাফিরদের নিকট চলে যাবে তাকে ফেরত দেয়া হবে না।
২। যে ব্যক্তি তাদের (কাফিরদের) নিকট হতে চলে আসবে তাকে ফেরত দিতে হবে।

রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন,

من ذهب منا إليهم فأبعده الله.

অর্থ: "যে ব্যক্তি আমাদের নিকট থেকে তাদের নিকট চলে যাবে আল্লাহ তাকে দূরে সরিয়ে দিবেন।"[১১২]
সহীহ মুসলিম এর অপর এক রেওয়ায়েতে আতিরিক্ত এসেছে, ..."যে ব্যক্তি ওদেরকে (কাফিরদের) পরিত্যাগ করবে আল্লাহ তার জন্য পথ বের করে দিবেন।"[১১৩]
৬। একইভাবে, এমন কোন চুক্তি করা জায়েজ নয় যাতে মুসলিম ভূমিতে কাফিররা তাদের ধর্মীয় আচার অনুষ্ঠান প্রকাশ্যভাবে করতে পারে। উদাহরণ স্বরুপ: চার্চ নির্মাণ করা, মিশনারীদের প্রকাশ্যে ঘোরাফেরা। এই সব কিছু মুসলিম এবং তাদের ঈমানের উপর ফিতনা তৈরি করবে। বিশেষ করে জাজিরাতুল আরবের মধ্যে।

---

[১১১] সূরা মুমতাহিনা, আয়াত ১০।
[১১২] সহীহ বুখারী এবং মুসলিম-এ বর্ণিত।
[১১৩] আল-কুরতুবী-৮/৩৯।

সুতরাং ফিলিস্তিনের রাজনৈতিক সমাধানের জন্য যে চুক্তি করা হয়েছে তা শুরু থেকেই বাতিল। যে কোন প্রকার সংশোধন জায়েজ নয়। কিন্তু আফগনিস্তানে কিছু শর্তের অধীনে চুক্তি জায়েজ।

১। সমগ্র মুসলিম ভূমি থেকে রাশিয়ান সৈন্যদেরকে প্রত্যাহার করতে হবে।

২। প্রত্যাহারের পর যদি আফগানিস্তানে ইসলামী রাষ্ট্র প্রতিষ্টিত হয় তবে পরবর্তীতে কোন হস্তক্ষেপ করা যাবে না যেমনঃ পূর্বের রাজাকে পুণরায় পতিষ্ঠা করার জন্য চেষ্টা করা অথবা এমন সংস্কৃতি চালু করা যাতে আফগানদের ইমানকে হেয় প্রতিপন্ন করা হয়।

৩। অবশ্যই শর্তহীনভাবে সৈন্য প্রত্যাহার করতে হবে।

রাশিয়ানদের অবশ্যই মুজাহিদীনদের ব্যাপারে আস্থা থাকতে হবে যে, তারা চুক্তির শর্তসমূহ মেনে চলবে।

وَإِنْ جَنَحُوا لِلسَّلْمِ فَاجْنَحْ لَهَا وَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ إِنَّهُ هُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ.

অর্থ: "যদি তারা সন্ধির দিকে ঝুঁকে পড়ে তবে তুমিও সন্ধির দিকে মনোযোগী হও এবং আল্লাহর প্রতি নির্ভর করো। তিনিই সর্বশ্রোতা, সর্বজ্ঞ।"[১১৪]

আস-সুদ্দি রহ. এবং ইবনু জায়িদ রহ. বলেছেনঃ "কাফিররা যদি চুক্তির আহ্বান করে তবে সাড়া দিবে।"[১১৫]

ইবনু হাজার আল-হাইসামি (ইবনে হাজার আল হাইসামী, আহমদ বিন মুহাম্মদ) রহ. বলেছেনঃ "মাত্র একটি হারাম শর্তের কারণে সমগ্র চুক্তি বাতিল হয়ে যায়। যেমনঃ এমন কোন শর্ত যা বন্দীদের মুক্ত করতে বাঁধা দেয়, দখলকৃত মুসলিম ভূমি থেকে শত্রু সৈন্য প্রত্যাহার করেত বাঁধা দেয়, কোন মুসলিম বন্দী মুক্ত হয়ে চলে আসে তাকে ফেরত পাঠাতে বাধ্য করে, কাফিরদেরকে হিজাজে (সমগ্র আবর ভূমি) বসবাস করতে দেয়, আমাদের ভূমিতে মদকে প্রতিষ্ঠিত করা, তাদের নিকট হতে যে মুসলিম আমাদের নিকট চলে আসে তাকে ফেরত দেয়া।"[১১৬]

---

[১১৪] সূরা আনফাল, আয়াত ৬১।

[১১৫] হাসীয়াহ আশ-শিরওয়ানী এবং ইবনে আল-কাসীম তার লিখিত তুহ্‌ফাহ আল-মুহতিজ ৯/৩০৬।

[১১৬] আল-কুরতুবী-৮/৩৯।

মুজাহিদীনদেরকেও অবশ্যই রাশিয়ানদের ব্যাপারে নিশ্চিত হতে হবে যে, তারা একনিষ্টভাবে চুক্তির জন্য আহ্বান জানাবে এবং ধোঁকা দিবে না। যারা শুধুমাত্র শান্তির মধ্যে থাকতে চায় অথবা মাঝামাঝি অবস্থায় থাকতে চায় তারা জিহাদের লক্ষ্য -ইসলামী রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠিত করার- ধরে রাখতে ব্যর্থ হয়। আর পশ্চিমা বিশ্ব কখনো এই চুক্তি মেনে নেবে না উপরন্তু তারা বাঁধা দিবে এবং বিরোধীতা করবে। এই লোকেরা জিহাদের মূল লক্ষ্য বুঝতে ব্যর্থ হয় এবং তাদের পরিস্কার ইসলামিক দৃষ্টিভঙ্গি নেই অধিকন্তু এই সমস্ত লোকদের জিহাদে অংশগ্রহণ করা অথবা নেতৃত্ব দেয়া জায়েজ নয়।

আল্লাহ সুবহানাহু তাআলা বলেছেনঃ

فَإِنْ رَجَعَكَ اللَّهُ إِلَى طَائِفَةٍ مِنْهُمْ فَاسْتَأْذَنُوكَ لِلْخُرُوجِ فَقُلْ لَنْ تَخْرُجُوا مَعِيَ أَبَدًا وَلَنْ تُقَاتِلُوا مَعِيَ عَدُوًّا إِنَّكُمْ رَضِيتُمْ بِالْقُعُودِ أَوَّلَ مَرَّةٍ فَاقْعُدُوا مَعَ الْخَالِفِينَ.

অর্থ: “যদি আল্লাহ তা’আলা (এ অভিযানের পর) তোমাকে এদের কোন একটি দলের কাছে ফেরত নিয়ে আসেন এবং তারা যদি তোমার কাছে (পুনরায় কোন যুদ্ধে যাবার) অনুমতি চায়, (তাহলে) তুমি বলো (না) কখনো তোমরা আমার সাথে (আর কোন অভিযানে) বের হবে না, তোমরা আমার সাথী হয়ে আর কখনো শত্রুর সাথে লড়বে না; কেননা তোমরা আগেরবার (যুদ্ধের বদলে) পেছনে বসে থাকা পছন্দ করেছিলে, (আজ যাও,) যারা পেছনে থেকে গেছে তাদের সাথে তোমরাও (পেছনে) বসে থাকো।”[১১৭]

ইমাম কুরতুবী রহ. বলেছেন, এটা ইঙ্গিত দেয় যে, নির্বোধদের জিহাদে অন্ত ভূক্ত করা জায়েজ নয়। অধিকাংশ ফুকাহাগণ বলেছেন, জিহাদে অহংকারী, নিরাশাবাদী, সন্ধিগ্ন, কাপুরুষ ব্যক্তিদেরকে সেনাবাহিনীতে অর্ন্তভূক্ত করা জায়েয নয়।”[১১৮]

---

[১১৭] সূরা তাওবা,আয়াত ৮৩।
[১১৮] আল-কুরতুবী-৮/২১৮।

উপসংহার

পরিশেষে আমরা বলতে চাই যে, অনেক যুক্তি এবং দলিল প্রমাণ বর্ণনা করলেই কেবল এই সমস্যার সমাধান হবে না বরং এগুলো অন্তর থেকে গ্রহণ করতে হবে আল্লাহ যদি অন্তরে নূর দেন, হিদায়াতের আলো দান করেন তাহলেই অন্তর হককে গ্রহণ করতে পারবে এবং সমস্ত ব্যাপারগুলো প্রকাশিত হবে। অপরপক্ষে অন্তর যদি অন্ধকারাচ্ছন্ন হয় তবে সে অন্তর দেখতে পায় না। যেমনটি ইরশাদ হয়েছে-

فَإِنَّهَا لا تَعْمَى الْأَبْصَارُ وَلَكِنْ تَعْمَى الْقُلُوبُ الَّتِي فِي الصُّدُورِ.

অর্থ: "বস্তুত চোখ তো অন্ধ হয় না, বরং অন্ধ হয় বক্ষস্থিত হৃদয়।" [১১৯]

অন্তর্দৃষ্টি দ্বারা দলিল বুঝতে হয়, রবের আয়াত দিয়ে তাকওয়ার চাষ করতে হয়, আগ্রহ এবং আনুগত্যের মাধ্যমে ইবাদাত করতে হয়। মহান আল্লাহ বলেন,

قَدْ جَاءَكُمْ بَصَائِرُ مِنْ رَبِّكُمْ فَمَنْ أَبْصَرَ فَلِنَفْسِهِ وَمَنْ عَمِيَ فَعَلَيْهَا وَمَا أَنَا عَلَيْكُمْ بِحَفِيظٍ.

অর্থ: "...তোমাদের প্রতিপালকের নিকট হতে তোমাদের নিকট স্পষ্ট প্রমাণ অবশ্যই এসেছে। সুতরাং কেউ তা দেখলে তার দ্বারা সে নিজেই লাভবান হবে, আর কেউ না দেখলে তাতে সে নিজেই ক্ষতিগ্রস্থ হবে। আমি তোমাদের সংরক্ষক নই।"[১২০]

এই দৃষ্টিভঙ্গি অন্তর খুলে দেয়। যা শুধুমাত্র অধ্যয়নের মাধ্যমে অর্জন করা সম্ভব নয়। বরং এটা এমন এক বুঝশক্তি যা আল্লাহ তাঁর (কিতাব ও দ্বীনের জন্য) বান্দার প্রতি দান করেন অন্তরের ধারণ ক্ষমতা অনুযায়ী। এই দৃষ্টিশক্তি একজনের অন্তরে উর্বর হতে থাকে যা সত্য এবং মিথ্যার মধ্যে পার্থক্য করতে পারে, আল্লাহ তাআলা বলেছেন,

إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَةً لِلْمُؤْمِنِينَ.

অর্থ: "এতে অবশ্যই মুমিনদের জন্য নির্দশন রয়েছে।"[১২১]

---

[১১৯] সূরা হাজ্জঃ ৪৬।
[১২০] সূরা আনআমঃ ১০৪।
[১২১] সূরা হিজরঃ ৭৭।

মুজাহিদ (মুজাহিদ বিন জুবাইর আল-মাক্কী) রহ. বলেছেন, রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন,

اتقوا فراسة المؤمن فإنه ينظر بنور الله عزوجل.

অর্থ: "ঈমানদারের দৃষ্টির ভয় করবে কারণ একজন ঈমানদার সর্বশক্তিমান আল্লাহর নূর দ্বারা দেখে।" অতঃপর তিনি তেলাওয়াত করলেন,

إِنَّ فِي ذَلِكَ لآيَاتٍ لِلْمُتَوَسِّمِينَ.

অর্থ: "নিশ্চয়ই এতে পর্যবেক্ষণকারীদের জন্য রয়েছে নিদর্শনমালা।"[১২২]

যে সকল আলিম দুনিয়ার উপর আখেরাতকে প্রাধান্য দেয়, তারা যেন অবশ্যই তাদের খুতবায়, উপদেশ দানের ক্ষেত্রে আল্লাহকে ভয় করে কথা বলে কারণ আল্লাহর অনেক আইন মানুষের আইনের সাথে সাংঘর্ষিক। বিশেষ করে নেতৃস্থানীয় মানুষদের তৈরি আইন। যারা নফসের খাহেশাত ও নিজের ইচ্ছামত চলে তারা সবসময় হকের বিরোধীতা করে অথবা হকের একটা অংশ বর্জন করে। যে সকল আলিমরা ক্ষমতাকে ভালোবাসে এবং নিজের ইচ্ছামত চলে তারা সবসময় হকের বিরোধীতা করে, বিশেষ করে যখন তাদের অন্তরের সন্দেহ ঘনিভূত হয়, ফলে তাদের নীচ প্রবৃত্তি ওয়াসওয়াসার সম্মুখীন হয়। তখন সত্যকে লুকানো হয় এবং সত্যের চেহারাকে ঢেকে ফেলা হয়। যদি সন্দেহাতীতভাবে সত্য প্রতিষ্টিত তখন সে নিজের অজুহাত হিসেবে বিতর্কিত বিষয় গ্রহণ করে।

তাদের জন্য এবং তাদের মত লোকদের জন্য আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলা বলেছেন,

فَخَلَفَ مِنْ بَعْدِهِمْ خَلْفٌ أَضَاعُوا الصَّلاَةَ وَاتَّبَعُوا الشَّهَوَاتِ فَسَوْفَ يَلْقَوْنَ غَيًّا.

অর্থ: "তাদের পরে আসলো অপদার্থ পরবর্তীগণ, যারা সলাত নষ্ট করলো (সালাত না পড়ার মাধ্যমে অথবা পরিপূর্ণভাবে না পড়ার দ্বারা অথবা নির্দিষ্ট সময়ে না পড়ার মাধ্যমে) ও তারা লালসার শিকার হলো।"[১২৩]

এই জাতীয় লোকদের ব্যাপারে মহান আল্লাহ আরো বলেছেন,

---

[১২২] তিরমিযী কর্তৃক সংগৃহিত, আবু সাইদ আল খুদরী (রদিআল্লাহু আনহু) থেকে বর্ণিত। সূরা হিজরঃ ৭৫।

[১২৩] সূরা মারয়াম, আয়াত ৫৯।

فَخَلَفَ مِنْ بَعْدِهِمْ خَلْفٌ وَرِثُوا الْكِتَابَ يَأْخُذُونَ عَرَضَ هَذَا الْأَدْنَى وَيَقُولُونَ سَيُغْفَرُ لَنَا وَإِنْ يَأْتِهِمْ عَرَضٌ مِثْلُهُ يَأْخُذُوهُ أَلَمْ يُؤْخَذْ عَلَيْهِمْ مِيثَاقُ الْكِتَابِ أَنْ لا يَقُولُوا عَلَى اللَّهِ إِلا الْحَقَّ وَدَرَسُوا مَا فِيهِ وَالدَّارُ الْآخِرَةُ خَيْرٌ لِلَّذِينَ يَتَّقُونَ أَفَلا تَعْقِلُونَ.

অর্থ: "(কিন্তু) তাদের (অযোগ্য) উত্তরসুরীরা (একের পর এক) এ জমীনে উত্তরাধিকারী হলো, তারা আল্লাহ্ তা'আলার কিতাবেরও উত্তরাধিকারী হলো, তারা এ দুনিয়ার ধন-সম্পদ করায়ত্ত করে নেয়, (অপরদিকে মূর্খের মতো) বলতে থাকে, আমাদের (শেষ বিচারের দিন) মাফ করে দেয়া হবে, কিন্তু (অর্জিত সম্পদের) অনুরূপ সম্পদ যদি তাদের কাছে এসে পড়ে, তারা সাথে সাথেই তা হস্তগত করে নেয়, (অথচ) তাদের কাছ থেকে আল্লাহ্ তা'আলার কিতাবের এ প্রতিশ্রুতি কি নেয়া হয়নি যে, তারা আল্লাহ্ তা'আলা সম্বন্ধে সত্য ছাড়া কিছু বলবে না! আল্লাহ্ তা'আলার সেই কিতাবে যা আছে তা তো তারা (নিজেরা বহুবার) অধ্যয়নও করেছে, আর পরকালীন ঘরবাড়ি! (হ্যাঁ) যারা (আল্লাহকে) ভয় করে তাদের জন্যে তো তাই হচ্ছে উত্তম (নিবাস), তোমরা কি (এ বিষয়টি) অনুধাবন করো না?"[১২৪]

নফসের খাহেশাত অনুসরণ করার কারণে অন্তচক্ষু অন্ধ হয়ে যায়। ফলে সে সুন্নাত ও বিদআত এর মধ্যে পার্থক্য করতে পারে না। এটা প্লেগের মত রোগ। আলিমগণ যখন দুনিয়ার জীবনকে আখিরাতের উপর প্রাধান্য দেয়, নফস এবং নেতাদের হুকুম মত চলে তখন এই রোগ তাদের মধ্যে ঢুকে পরে।[১২৫]

তাদের বর্ণনা নিম্নের আয়াতে এভাবে দেয়া হয়েছে,

وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ الَّذِي آتَيْنَاهُ آيَاتِنَا فَانْسَلَخَ مِنْهَا فَأَتْبَعَهُ الشَّيْطَانُ فَكَانَ مِنَ الْغَاوِينَ. وَلَوْ شِئْنَا لَرَفَعْنَاهُ بِهَا وَلَكِنَّهُ أَخْلَدَ إِلَى الْأَرْضِ وَاتَّبَعَ هَوَاهُ فَمَثَلُهُ كَمَثَلِ الْكَلْبِ إِنْ تَحْمِلْ عَلَيْهِ يَلْهَثْ أَوْ تَتْرُكْهُ يَلْهَثْ ذَلِكَ مَثَلُ الْقَوْمِ الَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا فَاقْصُصِ الْقَصَصَ لَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُونَ.

অর্থ: "(হে মুহাম্মাদ!) তুমি তাদের কাছে (এমন) একটি মানুষের কাহিনী (পড়ে) শোনাও, যার কাছে আমি (নবীর মাধ্যমে) আমার আয়াতসমূহ

---

[১২৪] সূরা আরাফঃ ১৬৯।
[১২৫] আল ফাওয়ায়ীদ- ১১৩-১১৪।

াযিল করেছিলাম, সে তা থেকে বিচ্যুত হয়ে পড়ে, অতঃপর শয়তান তার িছু নেয় এবং সে সম্পূর্ণ গোমরাহ লোকদের দলভূক্ত হয়ে পড়ে। াামি চাইলে তাকে এ (আয়াতসমূহ) দ্বারা উচ্চ মর্যাদা দান করতে ারতাম, কিন্তু সে তো (উর্ধ্বমুখী আসমানের বদলে) নিম্নমুখী জমীনের াতিই আসক্ত হয়ে পড়ে এবং (পার্থিব) কামনা- বাসনার অনুসরণ করে। তার ১দাহরণ হচ্ছে কুকুরের উদাহরণের মতো, যদি তুমি তাকে দৌড়াতে থাকো ৩বু সে (জিহ্বা বের করে) হাঁপাতে থাকে, আবার তোমরা সেটিকে ছেড়ে দিলেও সে (জিহ্বা ঝুলিয়ে) হাঁপাতে থাকে, এ হচ্ছে তাদের দৃষ্টান্ত যারা আমার আয়াতসমূহ অস্বীকার করেছে, এ কাহিনীগুলো (তাদের) তুমি পড়ে শোনাও, হয়তো বা তারা চিন্তা- গবেষণা করবে।"[১২৬]

শুধুমাত্র দলিল উপস্থাপন করাই যথেষ্ট নয়, কারণ আলোকিত অন্তর দ্বারা সত্যকে উপলব্ধি করা যায়। অন্তর যখন দুনিয়ার প্রতি ঝুকে পড়ে এবং এই অন্তরের মানুষটা গুনাহের মধ্যে হাবুডুবু খায় তখন কালো দাগ দ্বারা অন্তর ঢেকে যায়। তার কারণ প্রত্যেক গুনাহের জন্য অন্তরে একটা করে দাগ পড়ে এই কালো দাগগুলি অন্তরে বাড়তে থাকে এবং এক সময় কালো রং দ্বারা অন্ত র পরিপূর্ণ হয়ে যায়। এবং এই কালো দাগই অন্তরকে আলোকিত হতে বাঁধা দেয়। যখন অন্তর অন্ধকারাচ্ছন্ন হয়, তখন যে কোন জিনিসকে আর সত্যিকার রুপে দেখা যায় না, যেমন সত্য ঘোলাটে হয়ে যায় এবং এর স্বরুপ প্রকাশিত থাকে না। অন্তরটা বদলে যায় এবং হককে বাতিল হিসেবে দেখে এবং বাতিলকে হক হিসেবে দেখে।

অন্তরে অবশ্যই তাক্বওয়া থাকতে হবে যাতে উপলব্ধি করার ক্ষমতা পায়। অন্ত র পরিস্কার হয় এবং এটা প্রতিটি জিনিসের আসল রুপকে নির্ণয় করতে পারে। ইরশাদ হয়েছে,

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنْ تَتَّقُوا اللَّهَ يَجْعَلْ لَكُمْ فُرْقَانًا وَيُكَفِّرْ عَنْكُمْ سَيِّئَاتِكُمْ وَيَغْفِرْ لَكُمْ وَاللَّهُ ذُو الْفَضْلِ الْعَظِيمِ.

অর্থ: "হে ঈমানদারগণ! যদি তোমরা আল্লাহর আনুগত্য করো এবং তাঁকে ভয় করো, তাহলে তিনি তোমাদেরকে ফুরকান (সত্য এবং মিথ্যার মধ্যে

---

[১২৬] সূরা আরাফঃ ১৭৫-১৭৬।

পার্থক্য করার মানদন্ড অথবা মাখরাজ, অর্থাৎ প্রতিটি কষ্ট থেকে মুক্তি পাওয়ার উপায়) দিবেন, তোমাদের পাপ মোচন করবেন এবং তোমাদেরকে ক্ষমা করবেন এবং আল্লাহ্ অতিশয় মঙ্গলময়।"[১২৭]

পূর্বযুগীয় আলিমগণ যখনই কোন প্রশ্নের উত্তর দানে দ্বিধা-দ্বন্ধে ভুগতেন তখন তারা বলতেন, "যুদ্ধের ময়দানের মুজাহিদদের প্রশ্ন করো কারণ তারা আল্লাহর সবচাইতে নিকটে আছে।"

তারা ইমাম আহমাদ বিন হাম্বলকে প্রশ্ন করেছিল "আপনার পরে আমরা কাকে প্রশ্ন (জানার জন্য) করবো?

তিনি উত্তর দিয়েছিলেন, "আবু বক্কর আল ওয়ারাককে জিজ্ঞাসা করবে কারণ সে সেরকম তাক্বওয়ার অধিকারী যেরকম থাকা উচিত এবং আমি আশা করি সে উত্তর দানে সফল হবে।"

একটি সহীস হাদীসে এসেছে রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন,

قد كان فيما مضى قبلكم من الأمم أناس محدثون فإن يك في أمتي أحد منهم فهو عمر بن الخطاب.

অর্থ: "তোমাদের পূর্বের জাতিতে প্রেরণাদানকারী লোক ছিল (যারা নবী নয়) এবং আমার উম্মতের যদি এমন কেউ থেকে থাকে সে অবশ্যই উমার রা.।[১২৮] উমার রা. সত্যিই এমনই একজন ছিলেন।"

আয়িশা রা. থকে বর্ণিত আর একটি হাদীস এসেছে যে,

كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يفتتح صلاته إذا قام من الليل: (اللهم رب جبريل وميكائيل، فاطر السموات والأرض عالم الغيب والشهادة أنت تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون، إهدني لما اختلف فيه من الحق بإذنك، إنك تهدي من تشاء إلى صراط مستقيم.

অর্থ: "রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম যখন রাতের সালাতে দাঁড়াতেন তখন তিনি এই বলে শুরু করতেন, হে জিবরাইল ও মীকাঈল -এর রব!, আসমান ও যমীনের সৃষ্টিকারী, দৃশ্য ও অদৃশ্যের পরিজ্ঞাতা, বান্দাদের

---

[১২৭] সূরা আনফালঃ ২৯।
[১২৮] সহীহ বুখারী ও মুসলিমে বর্ণিত।

বিবাদপূর্ণ বিষয়ের ব্যাপারে ফয়সালাকারী, তারা যখন হজ্জের ব্যাপারে মতপার্থক্য করে তখন আপনি আমাকে সঠিক পথে পরিচালিত করুন, আপনি যাকে চান তাকেই হিদায়াত দিয়ে থাকেন।"[১২৯]

পরিশেষে আমরা বরকতপূর্ণ আয়াত দিয়ে দুয়া করছি।

رَبَّنَا افْتَحْ بَيْنَنَا وَبَيْنَ قَوْمِنَا بِالْحَقِّ وَأَنْتَ خَيْرُ الْفَاتِحِينَ.

অর্থ: "হে আমাদের রব! সত্যের ব্যাপারে আমাদের ও আমাদের জাতির মধ্যে আপনি ফায়সালা করে দিন। আপনি হচ্ছেন সবচেয়ে উত্তম ফায়সালাকারী।"[১৩০]

আমরা সহীহ মুসলিম থেকে সেই দুয়ার পুনরবৃত্তি করছি যা রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম করতেনঃ

اللهم اهدنا لما اختلفوا فيه من الحق بإذنك إنك تهدي من تشاء إلى صراط مستقيم.

অর্থ: "হে আল্লাহ! তারা সত্যের ব্যাপারে যে বিবাদ করছে তার থেকে আপনি আমাদেরকে হিদায়াত দান করুন। আপনি যাকে চান হিদায়াত দান করে থাকেন।"

رَبَّنَا اغْفِرْ لَنَا وَلِإِخْوَانِنَا الَّذِينَ سَبَقُونَا بِالْإِيمَانِ وَلَا تَجْعَلْ فِي قُلُوبِنَا غِلًّا لِلَّذِينَ آمَنُوا رَبَّنَا إِنَّكَ رَءُوفٌ رَحِيمٌ

অর্থ: "হে আমাদের রব! আমাদের এবং ঈমানে আগ্রগামী ভাইদের ক্ষমা করে দেন এবং আমাদের অন্তরে কোন মুমিনদের প্রতি বিদ্বেষ রাখবেন না। হে আমাদের রব! আপনি অসীম দয়ালু এবং করুনাময়।"

হে আল্লাহ! আমাদের জীবনের পরিতৃপ্তি দান করুন এবং শহীদ হিসেবে কবুল করুন এবং মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর জামাআতে অন্তভূক্ত করুন। হে আল্লাহ! আপনি মহিমাময় এবং সমস্থ প্রশংসা আপনার, আমি সাক্ষী দিচ্ছি আপনি ছাড়া কোন ইলাহা নেই, আমি আপনার কাছে ক্ষমা চাই এবং আপনার কাছে তওবা করি।

আল্লাহ আমাদের সবাইকে কবুল করুন। আমীন।

---

[১২৯] সহীহ মুসলিম।

[১৩০] সূরা আরাফঃ ৮৯।

ইসলামের বিশুদ্ধ আকীদা ও সুমহান আদর্শ সবার কাছে পৌঁছে দিতে আপনিও অবদান রাখুন

খান প্রকাশনীর বই কিনুন, পড়ুন অপরকে হাদিয়া দিন